

তিনি গোয়েন্দা সিরিজ

ছুটি

রকিব হাসান

শীকারোভি:

বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রাপ্তী।

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
shabab.mustafa@gmail.com

Best viewed at 125%

ছুটি

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮৮

ছুটি



বড় মাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে বলল কিশোর পাশ। 'হ্যা, যা চাই সবই আছে। বিশাল প্রান্তর, জলাভূমি, পাহাড়, জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট খামার, বাড়ি-ঘর। কয়েকটা সরাইখানাও আছে। কোচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব আমরা। রাফিয়ানের খুমজা হবে।'

'ওর তো পেয়াবারো,' বলল পাশে বসা মুসা আমান। 'তনেছি, অনেক ব্যরগোশ আছে ওদিকে। হরিগণও।'

খোলা জানালা দিয়ে হ-হ করে বাতাস আসছে, কোকড়া লম্বা চুল উড়ছে কিশোরের। বাব বাব এসে পড়ছে কপালে, চোখেমুখে, সরাতে হচ্ছে। মুসার সে আনন্দ নেই, বাটো করে ছাঁটা চুল, খুলি কামড়ে ঝরোছে যেন।

গায়ের দিকে ছুটে চলেছে বাস।

'সুল পালিয়েছ বুঝি?' টিকিট বাড়িয়ে দিয়ে হাসল কঙাকটার।

'হ্যা, তা বলতে পাইবুন,' মাথা কাত করল মুসা। 'শহরের গ্যাজাম আব ভাস্তাণছিল না, সুলও ছুটি। পালিয়ে এসেছি।'

শেষ স্টেপেজে দামল বাস। আব সামনে যাবে না। বাস বন্দলাতে হবে।

সামনের দরজা দিয়ে নামল কিশোর আব মুসা। পেছনের দরজা দিয়ে বিন, তিনি আব রাফিয়ান।

বন্দলানো বাসের যাত্রাও শেষ হলো। কিশোরকে বলল কঙাকটার, 'শেষ। এবাব ফিরে যাব। ...তা কেখায় যাবে তোমরা? টিকাব তিলেজ?'

নামল পৌচ অভিযাত্তি।

ইডানো সবুজ মাঠ, ছোট পুকুরে হাস, মেঘেল ছায়া।

আনন্দে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান। চীর বকুলকে ঘিরে নাচানাচি করছে, ছুটে খিয়ে এক দৌড়ে ফিরে আসছে আবাব। লাফাছে। যেটি যেটি করছে হাসের দিকে যায় ধ্যাত ধ্যাত করে তাকে ধূমক দিল মন্ত এক রাজহাস।

'খাবাব-টাবাব কিছু কিনে নেয়া দরকার,' বলল কিশোর।

একটা দোকান দোখ্যে জিনা বলল, 'চলো না, গিয়ে দেবি, কি পা ওয়া যায়।'

'আবে, আবে!' ভেতরের আবেকটা ঘর থেকে দরজায় বেরিয়া এসেছেন এক মাইলা, দোকানের মালিক, 'কুত্তাটাকে ঢুকিয়েছ কেন? আবে কেমন লাফাছে। পাগলা নাকি? বের করো, বের করো।'

'না না, পাগল না,' হেসে বলল জিনা। 'বেশি খুশি। যা ওয়াব গুচ পেয়েছে তো।'

'অ। তাই বলো। তা কিছু মনে কোরো না। খাবারের দোকান, পরিষ্কার

রাখি। ওটাকে বাইরে রেখে এসো, প্রীজ !

'এই রাফি, আয়,' কুকুরটার গলার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে বলল কিশোর। 'তুই বাইরেই থাক। আমরাই আনতে পারব সব !'

কাউন্টারের পেছনে একটা তাক দেখিয়ে বলল মুসা, 'বাহ, দ্বারণ তো দেখতে। টেস্টও খুব ভাল হবে মনে হচ্ছে !'

'হ্যাঁ, ভাল,' বললেন মহিলা। 'আমি বানিয়েছি।' আমার ছেলে স্যান্ডউইচ খুব পছন্দ করে। এই তো, আসার সময় হয়ে এল তার। শ্রীন ফার্মে কাজ করে।

'আমাদের কম্যুনিটি বানিয়ে দিতে পারবেন?' জিজেস করল কিশোর। 'চিনি না জানি না, কোথায় আবার কোন গৌয়ে গিয়ে খুজব। লাক্ষের বাবস্থা সঙ্গেই নিয়ে যেতে চাই।'

'হ্যাঁ, তা পারব। কি কি নেবে? পনির, ডিম, কয়োর, গরু ?'

'গয়োর বাদে আর সবই দিন। চারটে কোক দেবেন ?'

'নাও না, নিয়ে আও,' বললেন মহিলা। 'ওই যে গেলাস।'

'আচ্ছা। আর হ্যাঁ, ভাল পাউরটিও দেবেন ?'

'খাবাপ জিনিস আমি বানাই না। তোমরা কোক আও, কেউ এলে ডেকো।' ভেতরের ঘরে চলে গেলেন আবার মহিলা।

'ভালই হলো,' বশুদের দিকে ফিরে বলল কিশোর। 'খাওয়ার ভাবনা না থাকলে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারব। আজ একদিনেই অনেক জায়গা দেখা হয়ে যাবে।'

'কতগুলো লাগবে?' হঠাতে দরজায় দেখা দিলেন মহিলা। 'আমার ছেলে এক বেলায়ই ছটা স্যান্ডউইচ খেয়ে ফেলে। বারো টুকরো রুটি লাগে বানাতে।'

'অ্যাঁ... আমাদের একেকজনের জন্মে আটটা করে বানান,' মহিলার চোখ বড় বড় করে দিল কিশোর। 'পাঁচ-আটে চাপ্পিশটা, সারা দিন চলে যাবে আমাদের।'

মাথা বাঁকিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহিলা।

'ভাবি কাজ দিয়ে ফেলোছি,' সহানুভূতির সুরে বলল রবিন। মাকে বেশি খাটিতে দেখলে কষ্ট লাগে তার, নিজেও গিয়ে সাহায্য করে। 'আটটা স্যান্ডউইচ তারমানে বোলোটা করে রুটির টুকরো, পাঁচ-শোলো আশি... নাহ, ভাবতেই খাবাপ লাগছে,' রাস্তাঘারে গিয়ে চুক্তে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু মহিলা আবার কিছু মনে করে বসেন ভেবে নাই না।

'আরে অত ভেব না,' প্রথমে এক চুমুকে আধ গেলাস কোকাকোলা খালি করেছে মুসা, আরেক চুমুকে বাকিটা শেষ করে টকাস করে গেলাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'দেখো, কে আসছে !'

দরজার বাইরে সাইকেল থেকে নামল লম্বা এক লোক, হ্যাতেল ধরে রেখেই ডাকল, 'মা ?'

কে লোকটা, চিনিয়ে দিতে হলো না। ওরা বুকল, মহিলার ছেলে, যে শ্রীন ফার্মে কাজ করে। রেখে এসেছে।

'আপনার মা ভেতরে,' বলল মুসা। 'ডাকব ?'

'থাক।' সাইকেল রেখে ভেতরে চুকল লোকটা, তাক থেকে স্যান্ডউইচগুলো

একটা প্যাকেটে নিয়ে আবার রওনা দিল। দরজার কাছে পিয়ে চেয়ে বলল, 'মাকে বোলো, আমি নিয়ে গেছি। তাড়াহড়ো আছে। ফিরতেও দেবি হবে। কিছু জিনিস নিয়ে যেতে হবে জেলে।'

জোরে জোরে প্যাডাল ঘূরিয়ে চলে গেল লোকটা।

হঠাৎ দরজায় উদয় হলেন আবার মহিলা, হাতে ইয়া বড় এক ঝটি কাটাৰ চুৰি। অবৈক হাতে ঝটি। 'ডিকেৰ গলা শুনলাম...ও-মা, স্যাণ্ডউইচও নিয়ে গেছে। ডাকোনি কেন?'

'তাড়াহড়ো আছে বলল,' জানাল কিশোৱ। 'ফিরতেও নাকি দেবি হবে আজ। কি নাকি নিয়ে যেতে হবে জেলে।'

'আমাৰ আবৈক ছেলে আছে জেলখানায়।'

মহিলাৰ কথায় এক সঙ্গে তাৰ দিকে ঘূৰে গেল চার জোড়া চোখ। জেলখানায়? কয়েনী? কোন জেলে?

ওদেৱ মনেৰ কথা বুৰো হাসলেন মহিলা। 'না না, বিক কয়েনী নয়। ওয়াৰডাব। খুব ভাল ছেলে আমাৰ। ওৱ চাকৱিটা আমাৰ মোটেই ভাল্লাগে না। চোৱ-ভাকাতেৰ সঙ্গে বাস, কখন কি হয়।'

'হ্যা, ম্যাপে দেখলাম,' বলল কিশোৱ। 'বড় একটা জেলখানা আছে এদিকে। আমৰা ওটাৰ ধাৰে-কাছেও যাব না।'

'না, যেয়ো না,' মহিলাৰ উশিয়াৰ কৱলেন, চুকে গেলেন ভেতৰে।

দাঙিয়ে আছে ছেলেৱা। অনেকক্ষণ। মাত্ৰ একজন খৰিদ্বাৰেৰ দেখা পেল। বিষয় চেহাৰার এক বৃক্ষ, পাইপ টানতে টানতে চুকল। দোকানেৰ চারদিকে তাকিয়ে মহিলাকে ঘূজল। তাৰপৰ এক প্যাকেট পাউডাৰ নিয়ে পকেটে ঢোকাল। কিশোৱ লক্ষ কৱল, পাউডাৰটা পীচড়াৰ গুমুখ।

পকেট থেকে পয়সা বৈৱ কৱে কাউটাৰে ফেলল লোকটা। পাইপ দাঁতে কামড়ে ধৰে রেখেই বলল, 'মহিলাকে বোলো, নিয়ে গোলাম,' বেৱিয়ে গেল সে।

লোকটাৰ গায়ে-কাপড়ে দুর্গন্ধি, কদিন গোসল কৱে না, কাপড় ধোয় না কে জানে। বুড়োৱ ভাবতঙ্গি আৱ গুৰু কোনটাই পছন্দ হলো না রাখিয়ানেৱ, চাপা গো গো কৱে উঠল।

অবশ্যে স্যাণ্ডউইচ তৈৰি শৈব হলো। বেৱিয়ে এলেন মহিলা। কপালে বিন্দু বিন্দু যাম। সুন্দৰ কৱে প্যাকেট কৱে দিলেন সব খাৰাব, প্রতিটি প্যাকেটেৰ ওপৰ পেনসিল দিয়ে লিখে দিলেন কোনটাতে কি আছে। পড়ে, অন্যানেৰ দিকে চেয়ে চোখ টিপল মুসা, ঝুকুকে সাদা দাঁত আৱ একটাও লুকিয়ে নেই, বেৱিয়ে পড়েছে হাসিতে। 'খাইছে! আল্লাহৰে, নিশ্চয় কোন পুল্য কৱে ফেলেছিলাম। এত খাৰাব?... আৱে, ওটাতে কি?'

'ফুট কেক,' হেসে বললেন মহিলা। 'বেশি নেই, চাৰ টুকুৰো' ছিল। দিয়ে দিলাম ফাট। পয়সা লাগবে না। থেয়ে ভাল লাগলে ফেৱাৰ পথে জানিয়ে যেয়ো।'

অনেক চাপাচাপি কৱেও কেকগুলোৰ জন্যে পয়সা দিতে পাৱল না কিশোৱ। কাউটাৰেৰ দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'পয়সা এল কোথেকে?'

বলল কিশোর।

'ও, রিকেট বুড়ো,' মাথা দোলালেন মহিলা। 'ঠিক আছে, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। ফেরার পথে দেখা করে যেয়ো। আর, খাবারের দরকার পড়লেই চলে এসো এখানে।'

'ঘাউ!'- মহিলার কথা শুনেই যেন সায় জানিয়ে মাথা বাঁকাল রাফিয়ান, দরজার বাইরে থেকে।

'ও, তুই। ভুলেই গিয়েছিলাম।' রাম্মাঘর থেকে বেশ বড় এক টুকরো হাড় এনে ছুঁড়ে দিলেন কুকুরটার দিকে।

মাটিতে আর পড়তে পারল না। শুনেই লুকে নিল রাফিয়ান।

মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

দুই

আহ, ছুটির কি আনন্দ! অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সূল। অটোবারের রোদে উক্ত আমেজ। শরতের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, গাছে গাছে হলুদ, লাল, সোনালি রঙের সমাঝোহ। রোদে যেন জুলছে। জোরে বাতাস লাগলে বোটা থেকে খসে যাচ্ছে মরা পাতা, চেউয়ো নৌকা যেমন দোলে, তেমনি দুলতে দুলতে নামছে মাটিতে।

ছোট যে গায়ে বাস থেকে নেমেছিল ওরা, সেটা পেছনে ফেলে এল। খুব ভাল লাগছে হাঁটতে। আৰাবিকা সকল পথে নেমেছে এখন। দু-ধারে পাতাবাহারের ঝাড় এত ঘন হয়ে জমেছে, আর এত উচু, ওপর দিয়ে দেখা যায় না ওপাশে কি আছে। মাথার ওপরে ডালপাতা দু-পাশ থেকে এসে গায়ে গায়ে লেগে টাদোয়া তৈরি করে দিয়েছে, তার ফাঁক-ফোক দিয়ে চুইয়ে আসছে যেন আলো।

'এ-তো দেখি একেবারে সুড়ঙ্গ,' বলল মুসা। 'নাম কি জায়গাটার?'

'এটার নাম কি ঠিক বলতে পারছি না,' বলল কিশোর। 'তবে এটা হরিণ পাহাড়ে চলে গেছে।'

'হরিণ পাহাড়?' সুরক্ষ কোচকাল রবিন।

'ডিয়ার হিল। বাংলা করলে হরিণ পাহাড়ই দাঁড়ায়, নাকি?'

'হ্যা, তা হয়,' তার বাংলা শব্দের সীমিত ভাণ্ডার খুজল রবিন। 'ওন্টেও ভাল লাগছে।'

'এখানের নামগুলোই সুন্দর। অন্ত উপত্যকা, হরিণ পাহাড়, কুয়াশা ঢুস, হলুদ দীঘি, ঘুঘুমারি...'

'ওষ্ঠ, দারণ তো!' বলে উঠল জিনা। 'অরিজিনাল নামগুলো কি?'

গাইত ড্যালি, ডিয়ার হিল, মিস্টি লেক, ইয়েলো পঙ, ডাঙ ডেখ...'

'অপূর্ব!' বলল রবিন। 'বাংলা ইংরেজি দুটোই।'

'বাংলাটাই থাক না তাহলে?' দ্বিধা করছে কিশোর, যার যার মাহুভাষ্য তার কাছে প্রিয়, বছুরা আবার কি মনে করে। 'বাইরের কারও সঙ্গে বলার সময়

ইঁরেজিই বলতে হবে, আমরা নিজেরা নিজেরা...'

'আমি রাজি। আমার কাছে বাংলাই ভাল লাগছে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'নিজের ভাষা কিছু কিছু জানি, কিন্তু সেটা না জানারই শামিল, বাংলার চেয়েও কম জানি। সেই কবে কোন কালে আফ্রিকা ছেড়ে চলে এসেছিল আমার দাদার ঘনা... তুল বললাম, চলে আসেনি, জোর করে খরে আনা হয়েছিল, গোলাম করে বাথাৰ জন্যে... শ্বেতাঙ্গৰা...'

আড়চোখে জিনার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর, 'থাক থাক, পুরানো ইতিহাস ধাঁটাধাঁটিৰ দৰকাৰ নেই, ঝগড়া লেগে যাবে এখন। ছুটিৰ আনন্দই মাটি হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...'

কথা বলতে বলতে এগোছে ওৱা

হঠাৎ 'কল হয়ে উঠল রাফিয়ান। খৰগোশেৰ গদ্দ পেয়েছে।

'আবিষ্কাপৰে!' জিন অবাক। 'এন্তো খৰগোশ! এই দিনেৰ বেলায়? আগৰ পোবেল বীপেও তো এত নেই।'

ইকিল পাহাড়ে এসে উঠল ওৱা। বসল, খৰগোশ দেখাৰ জন্যে। রাফিয়ানকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল, কিন্তু আটকে বাথা যাচ্ছে না। খৰগোশেৰ গদ্দে পাগল হয়ে গেছে যেন সে। এক ঝাড়া দিয়ে জিনার হাত থেকে বেল্ট ছুটিৰে নিয়েই দিল দৌড়।

'ৰাফি! ৰাফি!' চেঁচিয়ে উঠল জিন।

কিন্তু কে শোনে কাৰ কথা? রাফিয়ানেৰ কানেই চুকল না যেন ডাক, তাৰ এক চিহ্ন, খৰগোশ ধৰবে।

এত বোকা নয় খৰগোশেৰা যে চৃপচাপ বসে থেকে মুকুৰেৰ অঞ্চলৰে পড়বে। সুন্দৰ কৰে চুকে গেল গৰ্তে। ভোজবাজিৰ মত, এই ছিল এই? নই।

অনেক চেষ্টা কৰেও একটা খৰগোশ ধৰতে পাৰল না রাফিয়ান। তাৰ কাও দেবে হেসে গড়াগড়ি বেতে লাগল মুসা আৰ জিন।

অবশ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল বার্থ রাফিয়ান, জিন আধহাত বেৱিয়ে পড়েছে।

'তুল নাম বৈখেছে,' বলল রবিন। 'নাম বাথা উচিত ছিল আসলে খৰগোশ পাহাড়: চলো, উঠি।'

চূড়া পেৱিয়ে পাহাড়েৰ উল্লেটোদিকেৰ ঢাল ধৰে নামতে শুকু কৰল ওৱা। এদিকে খৰগোশ যেন আৰও বেশি। রাফিয়ান বোধহয় ভাৰল, অনাপাশেৰ চেয়ে এপাশেৰ ওৱা বোকা, তাই আবাৰ তাড়া কৰল।

সেই একই কাও। সুন্দৰ

ৱেণে গেল রাফিয়ান। গৰ্তে চোকা? দীড়াও, দেখালি মজা। বড় একটা খৰগোশকে বাইৰে দেৰে তাড়া কৰল। খৰগোশটা ও সেয়ানা। ত্ৰিকেবেকে এপাশে ওপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে বৌপ দিয়ে পড়ল বড় একটা গৰ্তেৰ ভেতৰ।

কোন রকম ভাৰনাচিহ্ন না কৰেই মাথা চুকিৱে দিল রাফিয়ান, চুকে গেল গৰ্তে। 'ভাৰণৰই পড়ল বিপদে, আটকে গেল শৰীৰ। না পাৰছে চুকতে, না বেৱোতে।

অসহায় ভাবে পেছনের পা ছুঁড়তে লাগল শুধু।

'আরে!' দৌড় দিল জিনা। 'এই রাফি, রাফি, বেরিয়ে আয়। আয় জলনি।'

বেরোতে পারলে তো বাঁচে এখন রাফিয়ান, জিনার ডাকের কি আর অপেক্ষা করে? কিন্তু পারছে তো না। পেছনের পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে খুলোর ঝড় তুলেছে, বেরোনোর চেষ্টায়।

পুরো বিশ মিনিট লাগল রাফিয়ানকে বের করে আনতে। প্রথমেই গর্তে ঢোকার চেষ্টা করল মুসা, তার বিকাট শরীর চুকল না। কিশোর আর জিনাও চুকতে পারল না। রোগা-পটকা ক্ষীণ দেখ একমাত্র রবিনের, তাকেই মাথা ঢোকাতে হলো অবশ্যে।

রাফিয়ানের পেছনের পা ধরে টানতে লাগল রবিন, তার অর্ধেক শরীর শহার বাইরে, অর্ধেক ভেতরে। কুকুরটার কাঁধের পেছন দিক আটিকে গেছে একটা মোটা শেকড়ে, টেনেও বের করা যাচ্ছে না। বাথায় শুওয়ে উঠল।

'আহ, এত জোরে টেনো না,' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'বাথা পারছে তা।'

'জোরে টেনেও তো বের করতে পারছি না,' গর্তের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল রবিন। 'জোর পাঞ্চি না। আমার পা ধরে টানো।'

অনেক টানা-হেঁচড়ার পর বের করা গেল অবশ্যে। বিষ্ণুস্ত চেহারা, কুইকুই করে গিয়ে জিনার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল রাফিয়ান। খুব ভয় পেয়েছে বেচারা।

'সাংঘাতিক বাথা পেয়েছে কোথাও,' কুকুরটার সারা গা টিপেটুপে দেখতে শুরু করল জিনা। ঢাকটে পা-ই টেনে টেনে দেখল। ভাঙ্গেনি। জখমও দেখা যাচ্ছে না। 'বাথা পেয়েছেই। নইলে এমন কোঁ কোঁ করত না। কিন্তু লাগল কোথায়?'

'ভয়ে অমন করছে,' কিশোর বলল। 'জখম থাকলে তো দেখতামই। পা-ও স্বাঙ্গেনি।'

কিন্তু নিষ্ঠিত্ব হতে পারল না জিনা। 'পশ ডাক্তারকে দেখালে হয় না?'

'এখানে পশ ডাক্তার পাবে কোথায়? খামোকা ভাবছ। রাফিয়ান ঠিকই আছে। চলো, হাঁটি।'

ঘৃণুমা-বিও পেরিয়ে এল ওরা। আলাপ-আলোচনা আর হাসিঠাপ্তা তেমন জমছে না। শুরু হয়ে আছে জিনা। বার বার তাকাচ্ছ পাশে রাফিয়ানের দিকে। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

বাথা পেয়েছে, এমন কোন ভাব দেখাচ্ছ না রাফিয়ান, ঠিকমতই হাঁটিছে, মাঝে মাঝে শুঙ্গিয়ে উঠিছে শুধু।

'এখানেই লাঞ্ছ সারা' মাক, কি বলো? আরেকটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জিঞ্জেস করল কিশোর।

'হাঁ, তা যায়,' মাথা কাত করল মুসা। 'নাম কি এটোর?'

'মাপে কোন নাম নেই। তবে আমি বাথতে পারি--চালু পাহাড়? খুব মানাবে। দেখেছ, কেমন চালু হয়ে নেমে গেছে অনেক দূর...' স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টি চো।

ভাল লাগার মতই দৃশ্য। মাইলের পর মাইল একটানা ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল

নঃসঙ্গ প্রান্তীর, ঘন সবুজ ঘাস চকচক করছে রোদে। তাতে চরছে লাঞ্ছুক হরিণ
আর উদ্ধাম ছোট ছোট বুনো ঘোড়া। যেন পটে আঁকা ছবি।

বসে পড়ল ওরা ঘাসের শুষ্ক্ষুর নরম কার্পেটে।

‘অবাবিত মাঠ গগন সলাট চুম্বে তব পদধূলি, ছায়া সুনিবিড় খাতির নীড় ছোট
ছোট প্রামণ্ডলি,’ দিগন্তের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, ঘন চলে গেছে তার
হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক স্থপ্রাজো, তার স্বপ্নের বাংলাদেশে। সেই
দেশটাও কি এত সুন্দর, ভাবল দে, কবিতা পড়ে তো মনে হয় এর চেয়েও সুন্দর।

‘দেশটা সত্যি ভারি সুন্দর,’ কিশোরের মতই দূরে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। ‘এই
সবুজ একদিন চেকে যাবে ধৰধৰে সাদা বরফে, তুমার ঝরবে পেঁজা তুলোর মত,
আকাশের মুখ অঙ্ককার, মেরু থেকে ধেয়ে আসবে হাড় কাপানো কনকলে ঠাণ্ডা...’

‘ওদিকে স্যাগউইচগুলো তো কান্দতে শুরু করেছে, খাচ্ছ না বলে,’ বেরসিকের
মত বাধা দিল মুসা। ‘কাবাচ্চা রেখে আগে পেটচ্চা সেবে নাও। আরে এই জিনা,
এত গভীর হয়ে আছো কেন? তোমার মুখ কালো দেখলে তো আমার বুকটা ছ্যাঁ
করে ওঠে...’

অন্য সময় হলে কথার-করাত চালাত জিনা, এখন শুধু মাথা নাড়ল। ‘বাফি...’

‘দূর তুমি খামোকা ভাবছ। কিছু হয়নি। দেখো, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।
পেটে বোধহয় খিদে...দেখছ না আমার কেমন খাবাপ লাগছে? ওরও বোধহয়
তেমনি...’

মুসার কথায় হেসে ফেলল জিনা। অন্যদের মুখেও হাসি ফুটল।

‘হঁ,’ সমবাদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা, সারুল হয়েছে। ডিকের মাঝের হাতে
যানু আছে। নে, বাফি, এই কাবাবটা চেখে দেখ।’

কাবাব চিবাতে চিবাতে আস্তে মাথা নাড়ল রাফিয়ান, গৌ করে উঠল। ব্যথায়,
না কেন, সে-ই জানে। কিন্তু এটাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে মুসা হাসল, ‘কি, বলেছি না
ভাল?’

সবার চেয়ে অনেক বেশিই খেলো রাফিয়ান, তবে চুপচাপ রয়েছে। এই
বাপাদ্বটাই ভাল লাগছে না জিনার।

একেক জনের ভাগে তিনটে করে স্যাগউইচ বাঁচল। আর অর্ধেক টুকরো করে
কেক। বাকি সব সাবাড় করে ফেলেছে।

‘ডিকের চেয়ে কম কি আমরা?’ ভুক্ত নাচাল মুসা। ‘ও ছ-টা খায়, আমরা
পোচটা...’

‘তুমি সাতটা খেয়েছ,’ শুধরে দিল রবিন। ‘নিজেদেরগুলো সেবেও আমাদের
ভাগ পেকে মেরেছ তুমি আর বাফি...’

‘ঘটঁ,’ করে শীকার করল যেন রাফিয়ান। কেকের টুকরোর দিকে চেয়ে লেজ
নাড়ছে। জিডে লালা। তাকে কেক দেয়া হয়েনি।

‘বলেছিলাম না, খেলেই ভাল হয়ে যাবে রাফস্টা,’ হেসে বলল মুসা। ‘নে খা,
তুই আমার কাছ থেকেই নে...’ রানিকটা কেক ভেঙে কুকুরটাৰ মুখের কাছে

ফেলল।

এক চিবান দিয়েই কোত করে পিলে ফেলল রাফিয়ান। করুণ চোখে তাকাল
মুসার হাতের বাকি কেকট্রুর দিকে।

তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল মুসা। 'না বাবা, আব দিজি না। রাতে থেতে হবে
আমার। তুমি বাপু যত পাও ততই চাও...' *

হাসল সবাই। কেটে গেল নিরানন্দ ভাবটা।

'চলো, ওঠা যাক,' বলল কিশোর। 'পাটটার আগেই ফার্মটায় পৌছতে হবে।
এখানে আবার তাড়াতাড়ি রাত নামে।'

'কোন ফার্ম?' জানতে চাইল রবিন।

'হলদ দীঘি।'

'যদি থাকার জায়গা না থাকে?

জিনাকে একটা ঘর দিতে পারলেই হলো। আমরা গোলাঘরে কড়ের গাদায়ই
যুমোতে পারব।'

'কেন, আমি পারব না কেন?' গলা লম্বা করে বাকি দিল জিনা।

'কারুণ, তুমি মেয়ে। ছেলের পোশাক পরে আছো বটে, কিন্তু মেয়ে তো।'

'দেখো, মেয়ে মেয়ে করবে না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম কিসে?'

'তাহলে ছেলে সেজে থাকো কেন?' ফস করে বলে বসল মুসা।

'থাকি, থাকি, আমার খুশি,' রেগে উঠল জিনা। 'তোমার কি?'

'এই তো রেগে গেল,' বিরক্ত হয়ে উঠল কিশোর। 'তোমাদের জুলায় বাপু
শাস্তিতে পরামর্শ করারও জো নেই।' জিনা, খামাকো জেন করছ। তুমি মেয়ে, কিছু
অসুবিধে তোমার আছে, ছেলেদের যা নেই। এটা কি অশ্রুকার করতে পারবে?'

চুল করে রইল জিনা। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে আব তর্ক করল না।
আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

মালপত্রের বোৰা পিঠে তুলে নিয়ে আবার রওনা হলো ওয়া। রাফিয়ান শান্ত।
লাফবোপ সব যেন তুলে গেছে, জোরে হাঁটার চেষ্টাও করছে না। পা ফেলছে অতি
সাবধানে, মেঘে চে়েপ। *

ব্যাপারটা জিনার চোখ ঢাল না। 'কি হয়েছে রাফি? খারাপ লাগছে?'

জবাবে শব্দ কাঁড়ি করল কুকুট।

আবও খানিক দূর যাওয়ার পর খোঢ়াতে শব্দ করল রাফিয়ান। পেছনের দী পা
ক্ষিমত ফেলতে পারছে না।

থামল সবাই।

বসে পড়ে পা-টা ভালমত দেখল জিনা। 'মনে হয় মচকেছে,' রাফিয়ানের পিঠে
হাত বেলাল সে।

শব্দ গাউক করে উঠল রাফিয়ান।

যেখানে হাত লাগলে বাথা পায় কুকুটা, সে জায়গার রোম সরিয়ে দেখল
জিনা। 'আরে, যখন! রক্ত জমেছে, ফুলেছেও। ওইটানাটানির সময়ই লেপেছিল।'

'দেখি তো,' বসে পড়ে কিশোরও দেখল। 'না, বেশি না। সামান্য। রাতে

পুরোহিত সেরে যাবে।'

'কিন্তু শিওর হওয়া দরকার,' খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে জিনাকে। 'কিশোর, ধাম
আর কন্দুর?'

'এই সামনেই। র্যাংকিন ভিলেজ। গীয়ে গিয়ে জিজেস করব, পও ডাঙ্গুর
কোথায় পাওয়া যাবে।'

'জলদি চলো। ইস, কেন যে এত বড় হলো কুকুরটা, নইলে কোলে করেই
নিতে পারতাম। হাঁটতেই পারছে না বেচার।'

'যা পারে হাঁটুক এখন,' বলল মুসা। 'একেবারে না পারলে তো বয়ে নিতেই
হবে। সে তখন দেখা যাবে।'

খুব আন্তে আন্তে হাঁটছে রাফিয়ান। বেশি ঘোড়াচ্ছে। শেষে আর পা-ই
ফেলতে পারল না। মচকালো পা-টা তুলে তিন পায়ে লাঞ্চিয়ে এগোল।

'ইস, কি কষ্ট বেচারাৰ...' কেন্দে ফেলবে যেন জিনা।

র্যাংকিন ভিলেজে এসে চুকল বিষণ্ণ দুলটা। গীয়ের ঠিক মাঝখানে একটা
সরাইখানা, নাম র্যাংকিন রেস্ট।

ঝাড়ন দিয়ে জানালার কাছের ধূলো বাড়ছে এক মহিলা।

কাছে গিয়ে জিজেস করল কিশোর, 'ম্যাডাম। কাছাকাছি পও ডাঙ্গু। কোথায়
আছে?'

রাফিয়ানের দিকে তাকাল মহিলা। 'বাছাকাছি বলতে তো ছ-মাইল দূরে,
ডারবিনে।'

তকিয়ে, এতটুকু হয়ে গেল জিনার মুখ। ছয় মাইল! কিছুতেই হেঁটে যেতে
পারবে না রাফিয়ান।

'বাস-টাস কিছু আছে?' জিজেস করল জিনা।

'না,' বলল মহিলা। 'তবে মিস্টার নরিসকে বলে দেখতে পারো। তার ঘোড়ার
গাড়ি আছে। কুকুরটার পা বেশি খারাপ?'

'হ্যা। ম্যাডাম, তাঁর বাড়ি কত দূর?'

'এই আধ মাইল। ওই যে পাহাড়টা, ওখান থেকে ডানে চাইলেই বাড়িটা
দেখতে পাবে। বড় বাড়ি। দেখলেই চিনবে। চারপাশে আন্তাবল, ঘোড়া পালে
মিস্টার নরিস। খুব ভাল মানুষ। যদি বাড়িতে না পাও, বোসো কিছুক্ষণ। রাতে
বাইরে থাকে না, যেখানেই ধাক ফিরে আসবে।'

মুগ্ধ পরামর্শ করে নিল চারজনে। কিশোর বলল, 'মিস্টার নরিসের কাছেই
যেতে হবে বোৰা যাচ্ছে। তবে সবার যাওয়ার দরকার নেই। মুসা, রবিনকে নিয়ে
কুমি হলুদ দীঘিতে চলে যাও। রাতে খাকার ব্যবস্থা করে রাখোগে। আমি জিনার
সঙ্গে যাচ্ছি। ফিরতে কত রাত হয় কে জানে।'

'ঠিক আছে,' বলল মুসা। 'টুচ আছে তো তোমার কাছে? গীয়ে তো রাত্তায়
বাতি নেই, রাতে খুব অস্ককার হবে।'

'আছে,' জানাল কিশোর।

'চলো, কিশোর,' তাড়া দিল জিনা। রবিন আর মুসার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে

বলল, 'রাতে দেখা হবে।'

জিনা আৰ কিশোৱ পাহাড়ৰ দিকে রওনা হলো। পাশে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেছে বাফিয়ান।

সেদিকে চেয়ে আনমনে বলল মুসা, 'ভাল হয়ে গেলেই বাঁচি। নইলে ছুটিটাই মাটি হবে।'

ঘূৰে আৱেক দিকে রওনা হলো সে আৰ বিবিন।
নিৰ্জন পথ।

এক জায়গায় একটা লোকেৰ সঙ্গে দেখা হলো। টমটম চালিয়ে আসছে। বিষণ্ণ চেহাৰা, মাথাটা আনেকটা বুলেটোৱ মত।

ভাকল মুসা।

ঘোড়াৰ রাশ টেনে ধামাল লোকটা।

'এ-ৱাস্তা কি ইয়েলো পও গেছে?' মুসা জিজেস কৱল।

'আ,' মাথা নইয়ে বলল লোকটা।

'সোজা? নাকি ভানে বাঁয়ে আৰ কোন গলি আছে?'

'আ,' আবাৰ মাথা নোয়াল লোকটা।

'এটাই পথ তো? মানে ওদিকে যেতে হবে?' গলা চড়িয়ে হাত নেড়ে দেখাল মুসা।

'আ,' বলে চাবুক তুলে পেছন দিক দেখাৰ লোকটা, তাৰপৰ পশ্চিমে দেখাল।

'ভানে ঘূৰতে হবে?'

'আ,' মাথা নোয়াল লোকটা। হঠাৎ খোঁচা মাৰল ঘোড়াৰ পেটে। লাকিয়ে সামনে বাঢ়ল ঘোড়া, আৱেকটু হলেই দিগেছিল মুসাৰ পা মাড়িয়ে।

'খালি তো আ আ কৱল,' মুসাৰ মতই রবিনও অবাক হয়েছে লোকটাৰ অন্তৰ ব্যবহাৰে। 'কি বোঝাল সে-ই জানে!'

তিনি

হঠাৎ কৱেই নামল রাত। সূর্য ডোবাৰ পৰ অন্ধকাৰ আৰ সময়ই দেয়নি সাঁকাকে। কাল মেষ জমেছে আকাশ।

'কি কাত দেখো,' গাঁটিৰ হয়ে বলল মুসা, 'দিনটা কি ভাল গেল। বোঝাই যায়নি বৃষ্টি আসবে।'

'তাড়াতাড়ি চলো,' বলল রবিন। 'ভিজে চুপচুপে হয়ে যাৰ। মাথা বাঁচানোৱ জায়গা নেই।'

মোড় নিয়ে কয়েক কদম এগিয়েই থমকে গেল দুজনে। খুব সক্ষ পথ, পাতাবাহারেৰ বোপেৰ সূড়স। সকালে এমন একটা পথে হেঁটে এসেছে। দিনেৰ বেলায়ই আবছা অন্ধকাৰ ছিল ওটাতে। এটাতে এখন গাঢ় অন্ধকাৰ।

'ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?' মুসাৰ কষ্টে সন্দেহ।

'কি জানি।' রবিনও বুঝতে পাৱছে না।

'যা থাকে কপালে, তেবে রবিনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল মুসা। কয়বার
মাড় নিয়েছে পথ, কতখানি একেবোকে গেছে, কিছুই বোঝা গেল না। অন্দের মত
গাঁথে চলেছে দুজনে। জুতোর তলায় ছপছপ করছে কাদা-পানি।

'নর্দমায় নামলাম না তো?' মুসা বলল। 'জুতোর ভেতর পানি ঢুকছে।'

'আমারও সুবিধে লাগছে না, মুসা। যতই এগোছি, পানি কিন্তু বাড়ছে। শেষে
গাঁথে কুয়া-টুয়ায় না পড়ে মরি।'

'টটো কোথায় রাখলাম?' ব্যাগের ভেতরে খুজছে মুসা। 'ফেলে এলাম, না
কি? রবিন, তোমারটা বের করো তো।'

টর্চ বের করে দিল রবিন।

জ্বাল মুসা। আলোর চারপাশ ঘিরে যেন আরও ঘন হলো অঙ্ককার। ঘুরিয়ে
গুরিয়ে দেখল সে। সামনে একটু দূরে, এক জায়গায় কাঠের বেড়া শুরু হয়েছে
গান্ধার এক পাশ থেকে, ওখানে আনিকটা জায়গায় পাতাবাহার নেই, কেটে সাফ
করা হয়েছে বোধহয়। পথটা সরু খালের মত, দু-ধারে উচু পাড়।

'বেড়াটা নিশ্চয় কোন ফার্মে গিয়ে শেষ হয়েছে,' বলল মুসা। 'আন্দুবল কিংবা
গঞ্জের খোয়াড় পেলেও মাথা বাঁচাতে পারি, ভিজতে হবে না। চলো, দেখি।'

পাড়ে উঠে বেড়া ধরে ধরে এগোল ওরা। ফসলের খেতের মাঝারান দিয়ে সরু
পথ।

'মনে হচ্ছে এটা শর্টকাট,' আন্দুজ করল মুসা। 'ফার্ম হাউসটা বোধহয় আর
বেশি দূরে না।'

একটা দুটো করে ফৌটা পড়তে শুরু করল, যে কোন মুহূর্তে বুপুরুপ করে
নামবে বৃষ্টি।

মুসার কথায় আশ্রম্ভ হতে পারল না রবিন। সত্যিই পাবে তো ফার্মটা?

জোরে নামল বৃষ্টি। বর্ষাতি বের করা দরকার। স্মৃত এদিক ওদিক তাকাল
ওরা। কোথায় চুক্তে বের করা যায়? ব্যাগের মধ্যে পানি ঢুকলে সব ভিজে যাবে,
দুর্ঘেস্থ পোছাতে হবে তখন।

মাঠের মধ্যেই দুটো আলের ফিলনস্টলে ঘন একটা পাতাবাহারের ঝোপ চোখে
পড়ল। দৌড়ে এসে তার ভেতরে ঢুকল দুজনে। ব্যাগ খুলে বর্ষাতি বের করল।

বৃষ্টি নামায় আরও ঘন হলো অঙ্ককার। টর্চের আলো বেশি দূর যাচ্ছে না।

'আলো তো দেখছি না,' বলল রবিন। 'কই ফার্মটা?'

'কি জানি। বুঝতে পারছি না। ফিরে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গে নামব? নাহ, তা-ও
গোধহয় ঠিক হবে না।'

'পথ যখন রয়েছে, নিশ্চয় কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু কোথায়?'

না বুঝে আর এগোনোর কোন মানে হয় না। দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ভাবছে
ওরা, কোন দিকে যাবে? কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল
রবিন।

হঠাতে করে এমনভাবে শুরু হলো শব্দটা, চমকে উঠল দুজনে। একে অন্যের
হাত চেপে ধরল। নির্জন মাঠে, অঙ্ককার রাতে এই দুর্ঘেস্থের মাঝে অঙ্কুর

শোনাল্লেছে।

ঘণ্টার শব্দ।

বেজেই চলেছে। প্রলয়ের সঙ্কেত যেন। অন্তরাত্মা কাপিয়ে দিল দুই
কিশোরের।

‘কোথায় বাজছে? এভাবে?’ ফিসফিস করল রবিন, জোরে বলার সাহস নেই।

কোথায় বাজছে মুসা জানবে কি করে? সে-ও রবিনের মতই চমকে গেছে।
কাছাকাছি নয়, দূরে কোথাও বাজছে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। এলোমেলো
বাতাস বইছে, একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক। বাতাস সরে গেলে শব্দও কমে
যাচ্ছে, যে-ই বাড়ছে, অগ্নি যেন তাদেরকে ধিরে ধরছে বিচ্ছিন্ন-ঘণ্টা-ধ্বনি।

‘ইস, থামে না কেন?’ দুর্কান্দুরু করছে মুসার বুক। ‘গির্জাৰ ঘণ্টা নয়।’

‘না, তা-তো নয়ই,’ কেপে উঠল রবিনের গলা। ‘কোন ধরনের সঙ্কেত ইতে
পারে...আমি শিখুন না।’ অশ্বস্তিতে হাত নাড়ল সে। বিড়বিড় করল, ‘যুক?...বীকন
কই?’

‘কি বিড়বিড় করছ?’

‘আঁা?...বীকন। পুরানো আমলে যুক্ত লাগলে ওভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে ইশিয়ার
করা হত গায়ের লোককে। সেই সঙ্গে আলোর সঙ্কেত—বীকন বলা হত।’

‘এখন তো পুরানো আমল নয়...’ চমকে থামে গেল মুসা।

রবিনের কথার মানে বুঝে ফেলেছে। ‘কি বলতে চাইছ?’

‘বুঝেছ তুমিও। এখন পুরানো আমল নয়, তাহলে অনুকারে বড়-বৃষ্টির মাঝে
ওই ঘণ্টা...’

‘চুপ চুপ! আর বোলো না,’ ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল মুসা। অনুকারে
কিছুই চোরে পড়ল না। টর্চের রশ্মির সামনে ওধু অনুনতি বৃষ্টির ফৌটা।

যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাতে করেই থেমে গেল শব্দ।

এরপরও কান পেতে রইল দুজনে। কিন্তু আর শোনা গেল না।

‘চলো, হাটি,’ বলল মুসা। ‘ফার্মটা খুঁজে বের করা দরকার। আবার কখন শুরু
হয়ে যায়...’

বেড়ার ধার ধরে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, ‘ওই যে।’

মুসাও দেখল। আলো। না, বীকন নয়, জুলছে-নিভছে না। একভাবে জুলছে
টিমটিম করে।

‘পাওয়া গেল বাড়িটা,’ জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

কাঠের বেড়া শেষ। একটা পাথরের দুয়ালের কাছে চলে এল ওরা। ওটার
পাশ দিয়ে এল ভাঙ্গাচোরা একটা গেটের কাছে।

তেতরে পা রেখেই নাফিয়ে সরে এল রবিন।

‘কি হলো?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘আলো ফেলো তো। ডোবায় না পড়ি।’

দেখা গেল, ডোবায় পা ডোবেনি রবিনের, বৃষ্টির পানি জমেছে ছোট একটা

১০৬। গঠিটার পাশ কাটিয়ে এল দুজনে।

কানা পাচপ্যাচ করছে সরু পথে। পথের শেষ মাথায় বাড়ির সানা দেয়াল, ছাঁটি একটা দরজা। পেছনের দরজা হবে, ভাবল মুসা। পাশের জানালা দিয়ে খালো আসছে।

জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। মাথা নিচু করে সেলাই করছে এক বৃক্ষ।

দরজার পাশে ঘণ্টার দড়ি-টাঙ্গি কিছু দেখতে পেল না মুসা। জোরে ধাক্কা দিল। সাড়া নেই। বন্ধ রইল দরজা। উঁকি দিল আবার জানালা দিয়ে। তেমনি ভাবে সেলাই করছে মহিলা, নড়েওনি।

'কানে শোনে না নাকি?' বলতে বলতেই দরজায় কিল মারল মুসা। সাড়া নাই না এবারও। খবরই নেই যেন মহিলার।

'এভাবে কিলাকিলি করে কিছু হবে না,' দরজার নব ধরে মোচড় দিল মুসা।
গুরে গোল নব। ঠেলা দিতেই পান্তা ও কুলল।

পা মোছার জন্যে ছেঁড়া একটা মাদুর বিছানো রয়েছে পান্তার ওপাশে। গাঁপরে সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের মাথায় পাথরের সিঙ্গি। সদর দরজার কাছেই ছানে আরেকটা দরজা, পান্তা সামান্য ফাঁক। হারিকেনের ঝান আলো আসছে।

ঠেলে পান্তা পুরো খুলে ভেতরে পা রাখল মুসা। তার পেছনে রবিন।

'তবু তাকাল না মহিলা। সেলাই করেই চলেছে।'

একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা।

এইবার দেখতে পেল বৃক্ষ। চমকে এত জোরে লাফিয়ে উঠল, ঠেলা লেগে উল্টি পড়ে গেল তার চেয়ার।

'সরি,' এভাবে চমকে যাবে বৃক্ষ, ভাবেনি মুসা। 'দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। শোনেননি।'

বৃক্ষে হাত চেপে ধরে আছে মহিলা। 'ইস্. কি ভয়ই না দেখালে!...কে আমরা? এই অঙ্ককারে কোথেকে?'

চেয়ারটা ঢূলে আবার জায়গামত সোজা করে রাখল মুসা। হাঁপাছে অরু খু। 'এটা কি ইয়েলো পও ফার্ম? এর খোজেই এসেছি আমরা। রাতটা কাটানো যাবে আরও দুজন আসছে।'

ঁজনীর মাথা দিয়ে বার দুই কানে টোকা দিল মহিলা, মাথা নাড়ল। 'ওনি না। হাঁপায় বলো। পথ হারিয়েছ?'

মাথা বাঁকাল মুসা।

'এখানে তো থাকতে পারবে না, আমার ছেলে পছন্দ করে না এসব। ও এল গুলে। সাংঘাতিক বদরাণী। চলে যাও।'

'মাথা নাড়ল মুসা। জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টিভেজা রাত দেখাল। তার আর গান্ধনের দেজা জুতো আর কাপড় দেখাল।'

'হঁ,' পথ হারিয়েছ তোমরা। ভিজেছ। ক্লোন। যেতে চাও না, এই তো? আমার ছেলেকে নিয়ে যে বিপদ। অচেনা কাউকে সহ্য করতে পারে না।'

রবিনকে দেখাল মুসা, তারপর হাত তুলে কোণের একটা সোফা দেখাল। নিজের বুকে হাত রেখে সরিয়ে এনে নির্দেশ করল দরজার দিকে।

বুদ্ধল মহিলা। 'তোমার বন্ধু সোফায় থাকবে বলছ। তুমি বাইরে কোন ছাউনি কিংবা গোলাঘরে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কিন্তু সেই একই ব্যাপার, আমার ছেলে পছন্দ করে না...' রবিন আর মুসার ভেজা মুখের দিকে চেয়ে অবশ্যে বোধহয় করুণা হলো মহিলার। ইতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোল একটা দেয়াল-আলমারির দিকে।

দরজা খুলল। আলমারি মনে করেছে দুই গোয়েন্দা, আসলে ওটা ঘরের আরেকটা দরজা। ওপাশ থেকে খুব সরু কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে।

রবিনকে বলল মহিলা, 'তুমি ওপরে চলে যাও। কাল সকালে আমি না ডাকলে আর নামবে না। আহ, যাও দেরি কোরো না।'

মুসার দিকে চেয়ে দ্বিধা করছে রবিন। 'তুমি ?'

'তুমি যাও তো,' রবিনের হাত ধরে ঠেলে দিল মুসা। 'আমি গোলাঘরে গিয়ে থাকি। গিয়ে দেখো জানালা-টানালা আছে কিনা। রাতে বেকায়দা দেখলে ডেকো। নিচেই থাকতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে,' গলা কাঁপছে রবিনের, অনিষ্টাসন্দেও পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

নোংরা পুরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল খুন্দে একটা চিলেকোঠায়। একটা মাদুর আছে, পরিষ্কারই, আর একটা চেয়ার। একটা কম্ফল ভাঁজ করা রয়েছে চেয়ারের হেলানে, বসার জায়গায় এক জগ পানি।

ছোট জানালাও আছে একটা। ওটা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকল রবিন, 'মুসা? মুসা?'

'হ্যা, শুনছি,' নিচ থেকে সাড়া দিল মুসা। 'চুপচাপ করে থাকো। অসুবিধে না হলে আর ডেকো না।'

চার

সঙ্গে থাবার যা আছে রেখে নিল রবিন। ঢকঢক করে আব জগ পানি রেখে মাদুরের ওপর কম্ফল বিছিয়ে উয়ে পড়ল। জিনা আর কিশোরের সাড়ার আশায় কান থাড়া। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ খোলা রাখতে পারল না। সারা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাইরে বেশি হাঁটাহাঁটি করার সাহস হলো না মুসার। বৃক্কার ছেলের সামনে যদি পড়ে যায়? সহজেই খুজে পেল গোলাঘরটা। টর্চের আলো সাবধানে ঘুরিয়ে দেখল।

ঘরের এক কোণে খড়ের গাদা। শোয়ার জায়গা পাওয়া গেল। ভাঙ্গা একটা বাক্স দেখে সেটা তুলে এনে দরজার পাশে রেখে বসল। ভাঙ্গা পেটেটা দেখা যায়। কিশোর আর জিনা আসবে তো এই বৃষ্টির মাঝে? এলে কি ওই গেট দিয়েই চুকবে?

। পাটির তেতুর ছুঁচো নাচছে। খাবার বের করে খেতে শুরু করল মুসা, একই
গাল গাল রাখল পেটের দিকে। বৃক্ষর ছেলে এলে দেখতে পাবে।

মুন জড়িয়ে আসছে চোখ। ঘন ঘন হাই তুলছে। তবু জোর করে চোখ খোলা
গাল গালে রইল।

কেউ এল না। দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেই চোখে পড়ে বাড়ির আনালা। বৃক্ষকে
মেঝে গায়, সেলাই করছে।

।। ১ মটো পেরোল। আটো বাজে। জিনা আর কিশোরের জন্যে উদ্ধিষ্ঠ হয়ে
প্রচলিত মুসা।

গুড়তে সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখল বৃক্ষ। মুসার দৃষ্টির আড়ালে চলে
গোল, কিন্তু এল না। হাবিকেনটা আগের জাফ্যায় জুলছে, ছেলের জন্যেই জুলে
গোলে শেষে বোধহয় বৃক্ষ, মুসা ভাবল।

গুঁপি খেমেছে। আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। তারা ফুটেছে। ছুটে চলা মেঘের
কাকে টিক্কাবুকি দিচ্ছে দে। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে।

প্রণীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভয় অনেকখানি কেটে পেল মুসার। গোলাঘর
থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এগোল আনালার দিকে। মনে কৌতুহল। কি করছে
বৃক্ষ?

কোণের নড়বড়ে সোফাটোয় তয়ে পড়েছে মহিলা। গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে
কান্থ। বোধহয় ঘুমিয়ে শেষে।

আগের জাফ্যায় ফিরে এল মুসা। জিনা আর কিশোরের জন্যে বসে থেকে আর
লাগ আছে?—ভাবল সে। রাতে ওরা ফিরবে বলে মনে হয় না। রাফিয়ানকে
জাফ্যাত দেখিয়ে রাখিকিন ভিলেজে ফিরে সরাইখানায় রাত কাটানোটাই স্বাভাবিক।
মুঁপি না তলে অবশ্য অন্য কথা ছিল।

গুঁপি করে হাই তুলল সে। 'যাই, তয়ে পড়িগে,' মনে মনে বলল। 'যদি আসেই
বারা, মাড়া পাব।'

দরজা। বন্ধ করল মুসা। খিল-টিল কিছু নেই। দুটো করে আঞ্চটা লাগানো আছে
গোলের নাইরে। ডেতরের আঞ্চটা দুটোয় দুটো লাঠি চুকিয়ে আটকে দিল সে।
বিগেগ শিকল। কেন এই সাবধানতা, নিজেই জানে না। হয়তো অবচেতন মনে
জিখায়। করেছে বৃক্ষার ছেলের বদমেজাজের কথাটা।

শাফের গাদায় শতে না শতেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেল মুসা।

কাটিয়ে আবও পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, পূর্ণতা পায়নি
জাফ্যায়, লেন যথেষ্ট বড় হয়েছে। পাথরের পুরানো বাড়িটাকে কেমন রহস্যাময় করে
পুরোট ঘোলাতে জ্যোৎস্না।

বৃক্ষে মুসা শ্বেত দেখাতে বাফিয়ানকে, জিনা, কিশোর আর ভাঙা বাড়িটাকে,
শাফের গাদায়ে দেখে গটাধৰনি।

ঠঠঠ ডেকে গেল ঘূম। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। আরি, খোঁচা
শাফাটে কেন? নিছানায় কাটা ছড়িয়ে দিল নাকি কেউ? তারপর মনে পড়ল, খোঁচা
শাফ শাফ নাই। তয়ে আছে খড়ের গাদায়। কাত হয়ে গলো, কুঁজো হয়ে।

একটা মনু শব্দ কানে এল। গোলাঘরের কাঠের বেড়ায় আঁচড়ের মত। উঠে
বসল মুসা। ইন্দুৱ?

কান পেতে আছে সে। শব্দ ঘরের ভেতর ন্য, বাইরে থেকে আসছে। থেমে,
একটা নিসিটি সময় বিবরণ দিয়ে আবার তরু হলো। তারপর, মুসার ঠিক মাথার
ওপরে ভাঙ্গা একটা জানালাগ আলতো টোকা দিল কেউ।

চুপ করে আছে মুসা। ইন্দুৱে আঁচড়াতে পারে, কিন্তু টোকা দিতে পারে না।
তাহলে কে? দম বক্ষ করে পড়ে রইল সে।

'রবিন! রবিন?' ফিসফিসিয়ে ডাকল কেউ।

সাড়া দিতে শিয়েও দিল না মুসা। গলাটা অচেনা, কিশোরের মত লাগছে না।
কিন্তু রবিনের নাম জানল কি ভাবে? কেউ যে তথ্যে আছে ঘরে, এটাই বা কি করে
জানল?

আবার টোকার শব্দ হলো, গলা আরেকটু ঢাকিয়ে ডাকল লোকটা, 'রবিন!
রবিন?'

না, কিশোর নয়। জিনা তো নয়ই।

'ওষ্ঠো,' বলল লোকটা। 'অনেক দূর যেতে চেবে আমাকে। ওই মেসেজটা
নিয়ে এসেছি।'

জানালার কাছে যাওয়া উচিত হবে না, ভাবল মুসা। কিন্তু এ-ও চায় না, কোন
সাড়া না পেয়ে ভেতরে চুকে পড়ুক লোকটা। জানালার টোকাঠের কাছে মাথা
তুলল সে, কিন্তু মুখ বের করল না। মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে কষ্টস্বর বিকৃত বরে
ফিসফিস করে জবাব দিল, 'আছি, বলো।'

'এত ঘূম?' বিবর্ণ হয়ে বলল লোকটা। 'কখন থেকে ডাকছি। শোনো, জেরি
মেসেজ দিয়েছে, টু-ট্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়াদ। আবারও বলেছে, টিকসি
নোজ। তোমাকে এটা দিতে বলেছে, টিকসির কাছে আছে আরেকটা। নাও,
জানালা দিয়ে এক টুকরো কাগজ ছেড়ে দিল সে ভেতরে।

বেড়ার ছোট একটা ছিপ্প দিয়ে দেখছে মুসা। বিষম মুখ, কুতুকুতে চোখ, মাথাটা
দেখতে অনেকটা বুলেটের মত।

'রবিন?' আবার বলল লোকটা। 'সব মনে রাখতে পারবে তো? টু ট্রীজ। ব্ল্যাক
ওয়াটার। ওয়াটার মেয়াদ। টিকসি নোজ।...যাই তাহলে।'

চলে গেল লোকটা।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে মুসা। কে লোকটা?
রবিনের নাম জানল কিভাবে? আর তাকেই বা রবিন মনে করার কারণ কি? রবিনের
নাম যখন জানে, তার নাম কি জানে না? ঝাত দুপুরে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি এক
অদ্ভুত মেসেজ দিয়ে গেল, মাথামুণ্ড কিছুই বোকা যায় না।

ঘুম আর আসবে না সহজে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। কিছু নেই,
শুধু রহস্যময় বাড়িটার নির্জনতা, আর খোলা আকাশ।

খড়ের গান্দায় বসে পড়ল সে। টর্চ জেলে দুখল কাগজের টুকরোটা। ময়লা,
এক পাতার ছেঁড়া অর্ধেক। পেনসিলে কিছু আঁকিবুকি রয়েছে, যার কোনই মানে

গোপ্য যায় না। কিছু শব্দ রয়েছে এখানে ওখানে, যেন্তে আরও দুর্বোধ্য।
‘মামাৰ মাথায় কুলোবে না,’ অনন্মনে বলতে কলতে কাগজটা পকেটে রেখে
মিল দে। তবে পড়ল আবার।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে। কুকুর-কুকুলী হয়ে গেল মুসা, গায়ের ওপর কিছু
থাইনে দিল। ঠাণ্ডা কম লাগবে।

তবে তবে ভাবছে। তন্মো খাগল একসময়।

কিন্তু পুরোপুরি ঘূম আসার আগেই টুটে গেল আবার। বাইরে সতর্ক পায়ের
শব্দ ঘৰে এল লোকটা ?

দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। ঠেলা দিল পান্তায়। খুলল না দেখে
থোকে ধূকা দিল। সে বোধহয়, ভাবছে, কোন কিছুৰ সঙ্গে আটকে গেছে পান্তা।
ঠোকেলতে আঞ্চটা থেকে অসে পড়ল নাঠি, ভেতরে চুকল লোকটা। আবার
ঠোকেলে দিল দরজা।

দরজার কাছে খলকের জন্যে লোকটার চেহারা দেখেছে মুসা। না, বুলেট-
মাখা নয়। এর মাথায় ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল। খড়াস খড়াস করছে বুকের ভেতর।
খড়ের গাদায় উত্তে আসবে না তো লোকটা?

না এল না। একটা চটের বন্দুর ওপর বসে নিজে নিজেই কথা শুন করল।
‘ইলো কি, আৰ কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?’ বিড়বিড় করে আৰও কিছু বলল,
মুখে পারল না মুসা।

‘দুৱ কি ইলো?’ বলে উঠল লোকটা। মাথার ওপর দু-হাত তুলে গা মোড়ামুড়ি
কুল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার দরজার কাছে। বাইরে উকি দিয়ে কি দেখল,
ঘৰে এসে বাল আবার আগের জাফ্রায়।

বিড়বিড় করছে না আৰ, একেবাৰে চুপ। হাই তুলছে।

গাতাই দেখছে তো, অবাক হয়ে ভাবল মুসা, নাকি স্বপ্ন?

চুপ করে পড়ে রইল সে। স্বপ্ন দেখতে শুন কুল এক সময়, একটা বনের
কেচৰ দিয়ে চলেছে। যেনিকেই তাকায়, তথু জোড়ায় জোড়ায় গাছ। বিচিত্র ঘণ্টার
শব্দ কানে বাজছে একটোনা।

ছিটীয়বার ঘূম ভাঙল মুসাৰ। সকাল হয়ে গেছে। প্রথমেই চোখ গেল বন্দুটার
মিকে। কেউ নেই। গোলাঘৰে খড়েৱ গাদার ভেতরে শৰীৰ চুবিয়ে রয়েছে সে
ধূকা।

পাঁচ

ঘুঁটৈ আড়মোড়া ভাঙল মুসা। সারা গায়ে খুলো-মাটি, নোংৰা। খিদেও পেয়েছে।
আশ্চা, পয়সা পেলে কুটি, পনিৰ আৰ এক গেলাস দুধ দেবে তো বৰ্কা? রবিনেৰে
নিক্ষণ খিদে পেয়েছে। কি অবস্থায় আহে কে জানে।

সাধারণে নাইরে বেৰোল মুসা। চিলেকোঠাৰ জানালাৰ নিচে এসে দাঢ়াল।
রবিনেৰ উঁফ্যা মুখ দেখা যাচ্ছে।

'কেমন?' হত নেড়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাল,' হাসল রবিন। 'কিন্তু নিচে তো নামতে পারছি না। অহিলার ছেলে সাংঘাতিক বদমেজাজী। কয়বার যে গালাগাল করেছে বেচারী বৃড়িটাকে। কানে শোনে না, এটা যেন তার দোষ।'

'তাহলে ও বেরিয়ে যাক,' চট করে ফিরে তাকাল মুসা, কে জানি আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে চুকল আবার গোলাঘরে।

বেড়ার ছিস্ট দিয়ে দেখল, বেটে এক লোক, চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মানে হয়, মাথায় এলোমেলো চুলের বোবা। গতরাতে ছিটীয় বাবু একেই চুক্ত দেখেছে মুসা।

আবো, এনিকেই তো আসছে।

কিন্তু না, গোলাঘরে চুকল না লোকটা। পাশ দিয়ে চলে গেল। গেট খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল মুসার।

'চলে গেছে,' ভাবল মুসা। 'যাই এবাব।'

আবার বেরোল গোলাঘর থেকে।

দিনের আগোয় বড় বেশি বিষ্ট খাবাকে ছোট্ট সাদা বাড়িটাকে। নঃসঙ্গ, নির্জন।

ঘরে চুকল মুসা। গালাঘরে পাওয়া গেল বৃক্ষাকে। সিংকে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে। মুসাকে দেবে অশ্বাসি ফুটল চোখে। 'ও, তুমি। ভুলেই পিয়েছিলাম তোমাদের কথা। জলনি তোমার বন্ধুকে নিয়ে চলে যাও। আমার ছেলে দেখলে...'

'কিছু কঢ়ি আর পনির দিতে পারবেন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। বুঝল, লাভ হবে না। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও উনতে পাবে না মহিলা, একেবারেই কালা। হাত তুলে টেবিলে রাখা কঢ়ি দেখাল-সে।

'না না!' অন্তকে উঠল বৃক্ষ। 'জলনি চলে যাও। আমার ছেলে এসে পড়বে।'

ঠিক এই সময় পায়ের শব্দ হলো। মুসা কিছু করার আগেই ঘরে চুকল লোকটা, যাকে আনিক আগে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

হাতের ছেটি বৃক্ষিতে কয়েকটা ডিম।

চোখ গরম করে তাকাল লোকটা। 'এই ছেলে, এখানে কি? কি চাই?'

'না, কিছু না...মানে, এই...আমাদের কাছে কিছু কঢ়ি বেচবে কি না...'

'আমাদের? তুমি একা নও?'

নিজেকে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে হলো মুসার, মুখ ফসকে 'আমাদের' বলে ফেলেছে। কিন্তু ফেলেছে তো ফেলেছেই, কথা ফিরিয়ে নেয়া আর যাবে না। চুপ করে রইল।

'কি হলো? কি নেই কেন?' গর্জে উঠল লোকটা। 'এতক্ষণে বুঝলাম, ডিম যাব কোথায়? তোমরাই চুবি করো বোজ...দাঁড়াও, দেখাছি মজা...'

আর কি দাঁড়ায় মুসা? বোড়ে দিল দৌড়। গেট পেরিয়ে ছুটল। দুপদুপ করছে বুক, পেছনে তাকানোর সাহস নেই।

পায়ের আওয়াজ নেই ওনে ফিরে তাকাল মুসা। আসেনি লোকটা। ঘর

খেকেই বোধহয় বেরোয়ানি।

পায়ে পায়ে আবার গেটের কাছে ফিরে এল মুসা। উকি দিয়ে দেখল, একটা বড় কাঠের পাত্র হাতে নিয়ে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা, সাদা বাড়ির পেছনে। বাধচয় মুরগীর খাবার দিতে যাচ্ছে।

এই-ই সুযোগ। ঢুকে পড়ল মুসা। চিলেকোঠার জানালায় দেখা যাচ্ছে রবিনের মুখ। ইশারায় নেমে আসতে বলল তাকে মুসা।

রবিন নেমে আসতেই আর দাঢ়াল না। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। শাড়াড়ি পা চালাল।

আশপাশের অকল রাতে লেগেছিল এক রকম, এখন লাগছে আরেক রকম।

অনেকবারি আসার পর প্রথম কথা বলল রবিন, ‘আরিভাপরে! নাংঘাতিক হাতামী লোক। আর ওটা একটা ফার্ম হলো নাকি? গুরুত্বের কিছু নেই। একটা কৃষ্ণও না।’

‘মনে হয় না ওটা ফার্ম,’ বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা, ফিরে আকাল একবার বাড়ির ভাঙ্গা গেটের দিকে। ‘শিওর, পথ হারিয়েছিলাম কাল রাতে। শুল জায়গায় উঠেছি। ইয়েলো পও ফার্ম হতেই পারে না।’

‘কাজটা খাবাপ হয়ে গেল তাহলে,’ জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রবিন। ‘কিশোর আর জিনা নিশ্চয় ফার্মে উঠেছে। আমাদের জন্মে খুব ভাববে।’

‘হ্যা,’ ছেট একটা পুকুর দেখে ঘুরল মুসা। ‘চলো, হাত-মুখ ধূয়ে নিই। চেহারার যা অবস্থা হয়েছে একেকজনের। লোকে দেখলে পাগল ভাববে।’

হাত-মুখ ধূয়ে কাপড় বদলে নিল দুজনে। ময়লা কাপড় ভরে রাখল বাগে, পরে সময়-সুযোগমত ধূয়ে নেবে।

পাড়ের ওপর উঠেছে একটা ছেলেকে দেখতে পেল, শিস দিতে দিতে আসছে। ‘হাস্তে,’ বলল হাসিখুশি ছেলেটা। ‘ছুটি কাটাতে বেরিয়েছে বুঝি?’

‘হ্যা,’ মাথা ঝাকাল মুসা। ‘আচ্ছা ভাই, ইয়েলো পও ফার্মটা কোথায়? ওই ওটা?’ বৃক্ষের বাড়িটা দেখাল।

‘আরে দুর, ওটা ফার্ম নাকি? ও-তো মিসেস ত্যাগার্ডের বাড়ি। টোংরা।’ নাক ঝুঁকাল ছেলেটা। ‘ওটার ধারে-কাছে যেয়ো না। বুড়ির ছেলে একটা ইবলিস, পায়ের লোকে ওর নাম রেখেছে ডারটি রবিন।... ইয়েলো পও ওই ওদিকে। ব্যাংকিন রেস্ট জাড়িয়ে পিয়ে, বাঁয়ে।’

‘থাংকু,’ বলল মুসা।

মাস্টের পথ ধরে হেঁটে চলেছে রবিন আর মুসা। পেটে খিদে। মনে ভাবনা। কিশোর আর জিনা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছে।

সকল পথটার কাছে এসে থামল, সেই যে সেই পথটা, যেটা র দু-ধারে পাথানাহারের জঙ্গল পথকে সুড়ক বানিয়ে দিয়েছে।

হাত ঢুলে দেখাল রবিন, ‘ওই যে দেখো, কোথায় নেমে যাচ্ছিলাম। নালা।’

‘নালায়েকের বাটা,’ বিড়বিড় করে টমটমওয়ালাকে গাল দিল মুসা।

ব্যাংকিন রেস্টের কাছে আসতেই কিশোর আর জিনা দেখা পাওয়া গেল।

মুসা আর বিনকে আগেই দেখেছে ওরা, নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে।
তাদের সঙ্গে জাফাতে জাফাতে আসছে রাফিয়ান।

নাস্তা কেউই থায়নি। রাখিন বেস্ট টুকল ওরা।

এগিয়ে এল সেই মহিলা, গতদিন ডাস্টীর দিয়ে যে জানালা পরিষ্কার করছিল।
‘কি চাই?’

‘নাস্তা থাইনি গ্রথনও,’ বলল কিশোর। ‘কিছু আছে?’

‘পরিজ আর মাঝন,’ জানাল মহিলা। ‘আর আমাদের নিজেদের কাটা পরা,
নিজেদের মুরগীর ডিম। নিজেদের হাতে চাক ভেঙে মধু এনেছি আমরা, আর
পাউরুটি আমি নিজে বানিয়েছি। চলবে? কফিও আছে।’

‘ইস, আস্টি, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আপনাকে,’ দাত আর একটা ও
ভেতরে রাখতে পারছে না মুসা। ‘জলনি করুন। একে বজ্জুর কিছু থাইনি।’

হেসে চলে গেল মহিলা।

ছোট গোছানো ডাইনিং রুমে আরাম করে বসল অভিন্নাবীন। বানিক পরেই
বাঘাঘর থেকে ভেসে এল ভাজা মাংস আর কড়া কফির জিতে পানি আসা গুৰু। লম্বা
জিভ বের করে ছোট চাটল রাফিয়ান।

কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মুসা, ‘ও তো দেখছি ভাল হয়
গেছে। মিস্টার নরিসের ওখানে গিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ,’ বলল কিশোর। ‘গিয়ে দেখলাম বাড়ি নেই। তাঁর স্ত্রী বললেন, এসে
পড়বেন শিগগিরই। বুর ভাল মহিলা। বসতে দিলেন। বসলাম।’

‘কিন্তু শিগগির আসেননি ভদ্রলোক,’ জিনা যোগ করল। ‘কাজে আটকে
গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার পর এলেন। বুর খারাপ লাগছিল, তাদের খাওয়ার
সময় উঞ্চন।’

‘তবে মিস্টার নরিসও ভাল,’ বলল কিশোর। ‘রাফির পা দেখল, চেপে ধরে কি
জানি কি করল... এমন জোরে কাউ করে উঠল রাফি, যেন ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে
যাবে... জিনা গিয়ে লাঙ দিয়ে পড়ল মিস্টার নরিসের ওপর... হাহ হাহ... ভদ্রলোক
তো হেসেই বাচেন না...’

‘যাব না,’ চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল জিনা। ‘যা বাধা দিয়েছে...’

‘ডাক্তার যা করেন, বুঝেও নেই করেন...’

‘হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,’ আবার রাফিয়ানের মাথায় হাত বোলাল মুসা।
‘একেবারে ভাল হয়ে গেছে। তাৰপৰ কি কৰলৈ?’

‘খাওয়ার জনো চাপাচাপি কুকুর কৰলেন মিসেস নরিস,’ বলল কিশোর।
‘কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। খাওয়ার পর বেনোতেও দিতে চাইলেন না।
বললেন, বৃষ্টিবাদলাৰ মধো গিয়ে কি কৰবে, তয়ে থাকো এখানেই। তোমৰা ভাৰবে
বললাম। শেষে, ন-টা বাজাৰ পৰ আকাশ পরিষ্কাৰ হলে ছাড়লেন। ইয়েলো পতে
গিয়ে তোমাদেৱ পেলাম না। ভাৰলাম, বঢ়িতে আটকে গেছ, অন্য কোথাও রাত
কাটাতে উঠেছ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। এতক্ষণে না পেলে পুলিশকে
জানাতাম।’

‘ফার্মটা কিন্তু দারুণ,’ মাথা কাত করল জিনা। ‘ছেট একটা ঘরে থাকতে দিল
খামাদের। বিছানা বেশ নরম। আমার বিছানার পাশে নিচে রাফি ওয়েছিল।’

‘আর কি কপাল,’ কপাল টাপড়াল মুসা, ‘আমি কাটিয়েছি খড়ের গাদায়...’

মন্ত্র ট্রে-তে খাবার বোঝাই করে নিয়ে ঘরে ঢুকল মহিলা। পরিজ থেকে ধোয়া
হোচ। সাদা বিরাট বাটিতে সোনালি মধু। ইয়া বড় এক ডিশ ভরতি মাংস-ভাসা
পাও ডিম সেদ্দ। আরেকটা বাসনে ভাজা ব্যাঙের-ছাগো রয়েছে।

‘ঝাইছে!’ হাতভালি দিয়ে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।

টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল মহিলা, ‘এগুলো খাও। টোস্ট, ডিম
ও মাংস আর মাখন নিয়ে আসছি। দুধ-কফি পরে আনব। নাকি এখনি?’

‘না না,’ ভাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, ‘পরেই আনুন।’ একটা ডিম ঢুলে নিয়ে
খাষ মুখে পুরল। সেটা অর্ধেক চিবিয়েই এক টুকরো মাংস নিয়ে কামড় বসাল।
প্লেটে খাবার ঢুলে নেয়ার ক্রম সইল না।

হেসে যাব যাব প্লেট টেনে নিল অনোরা। খাবার ঢুলে নিল প্লেট। বাকি
খাবার সহ ট্রে-টা মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল জিনা, ‘নাও, রাফিয়ানকেও কিছু
দিয়া।’

‘কি আর বলব রে ভাই,’ ব্যাঙের ছাতার শেষ টুকরোটা মুখে পুরল মুসা।
‘মন্ত্রকরে গিয়ে উঠেছিলাম এক বাস্তৱেন বাড়িতে। রবিন, তুমি বলো।’ দরজায়
মেঘ দিয়েছে মহিলা, হাতে আরেক ট্রে, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোদিকে
গোফেদা সহকারী।

সংক্ষেপে জানাল রবিন, পথ হারিয়ে কিভাবে গিয়ে উঠেছিল বাড়িটাতে।

‘মাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনল কিশোর, তারপর বলল, ‘যদ্য শুনে ভয় পেয়েছে,
মানুষ মুসা ভুতের ভয় ঢুকিয়েছে তোমার মনে?’

জোরে জোরে দু-হাত নাড়ল মুসা কি বোঝাতে চাইল স-ই জানে। মুখ ভর্তি
খাবার, কথা বলতে পারছে না।

‘অ, তোমরা ভাইলে শোনোনি কিসের ঘটা,’ বলল কিশোর। ‘পাগলা-ঘটি,
মাসম নরিস বলেছেন। জেল থেকে কয়েদী পাঞ্জালে নাকি ওরকেম বাজিয়ে ছেলিয়ার
কথে দেয়া হয় প্রাম্বাসীকে।’

‘আর আমরা এদিকে কি ভয়ই না পেয়েছিলাম,’ মলিন হেলে মাধা নাড়ল
গান।

‘না স্ব শেল হলো। এক টুকরো খাবানও পড়ে রইল না। উচ্ছিষ্টও না। যা ছিল,
গান। করে দিয়েছে রাফিয়ান।

‘কিন্তু সাতউইচ কিনে নেয়া দরকার,’ বলল কিশোর। ‘দুপুরে খাওয়ার জন্মে।’

‘ঠো, নাও।’ সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

গাইবে বেরিয়ে আস্তায় নেমে কিশোর বলল, ‘মুসা, রবিনের কথা তো বললে
হুম। গোপনের কিভাবে রাত কাটালে বললে না তো।’

সংক্ষেপে মনে পড়ল মুসার, রবিনকেও বলা হয়ান রাতের কথা। বলা:
ধৰকাশও প্রায়নি অবশ্য। দৃঢ়নে তখন ইয়েলো পও ঘোজায় এত বাস্ত, পেটে খিদে,

আলাপ করার মানসিকতাই ছিল না।

‘এক কাও হয়েছে কাল রাতে,’ বলল মুসা। ‘ওটা সত্তি ভূতের বাড়ি।’

‘তোমার কাছে তো সবই ভূত,’ হাত নাড়ল কিশোর। ‘চলো, কোথাও বসে শুনি। মনে হচ্ছে, অনেক কিছু বলীর আছে তোমার।’

নির্জন একটা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর পী ছড়িয়ে বসল ওরা।

সব খুলে বলল মুসা। চুপ করে শুনল সবাই।

প্রক্রিট দেকে কাগজটা বের করে দিল মুসা। ওটাৰ ওপৰ হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্তোৱা। এমন কি রাফিয়ানও ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল, যেন মহা-পণ্ডিত।

‘আগামাথা কিছুই তো বোৰা যাচ্ছে না,’ নিচেৰ ঠোটে চিমটি কাটছে কিশোৱ। ‘তবে নকশা-টকশা কিছু হবে। কিসেৱ কে জানে।’

‘ব্যাটা বলল,’ জানল মুসা, ‘টিকসিৰ কাছে নাকি বাকি অধিক আছে।’

‘এই টিকসিটা কে?’ বলল জিনা।

‘আগ্রাহ মালুম।’

‘রবিনেৰ নামই বা জানল কিভাবে? এই কিশোৱ, কি ভাৰছ?’ কনুই দিয়ে কিশোৱেৰ পাজৱে উত্তো দিল জিনা।

‘বুঝতে পাৰছি না,’ মাথা নাড়ল কিশোৱ।

‘আমি পাৰছি,’ দু-আঙুলে চুটকি বাজাল হঠাতে রবিন।

জিজ্ঞাসু চোখে তাৰ দিকে তাকাল কিশোৱ।

‘মুসা, ছেলেটা কি বলেছিল?’ বলল রবিন। ‘বলেছিল বুড়িৰ ছেলেৰ নাম ভাৱতি রবিন রেখেছে লোকে। গতৰাতে আমাকে নয়, ওকেই ডেকেছিল বুলেট-মাপা। বুড়িৰ ছেলে গোলাঘৰে তাৰ জন্মেই অপেক্ষা কৰেছে। জানে না, আগেই এসে তোমাকে ভাৱতি ডেবে মেসেজ দিয়ে চলে গৈছে লোকটা।’

‘ঠিক বলেছ,’ একমত হলো মুসা।

আনমনে বলল শুধু কিশোৱ, ‘ই।’

‘জেল পালানো কয়েদীৰ সঙ্গে এৱ কোন সম্পর্ক নেই তো?’ ধৰ্ম রাখল জিনা।

‘অসম্ভব না,’ বলল কিশোৱ। ‘ইতেও ধাৰে, মেসেজটা সে-ই দিয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু কাৰ কাছ থেকে আনল?’

‘জেৱি?’ মুসা বলল।

‘জেৱি, না? হতে পাৰে। হয়তো সে এখন জেলে আছে, তাৰ বশ্য বুলেট-মাথা, পালিয়েছে। বকুল কাছেই মেসেজটা দিয়েছে সে। তাহলে ভাবতি রবিন ওদেৱই দলেৱ কেউ। কোন বন-মতলৰ আছে ব্যাটাদেৱ।’

‘কি মতলব?’

‘তা আনি না। তবে হতে পাৰে, পাগলাগদি ওনেই ভাৱতি বুৰোছে, যে তাৰ বশ্য পালিয়েছে। মেসেজ নিয়ে আসবে তাৰ কাছে। তাই গোলাঘৰে এসে বসেছিল মেসেজেৰ অশ্বায়।’

‘হ্যা, তাই হবে,’ মাথা দোলাল মুসা।

‘অখচ তুলে মেসেজটা পড়ল এসে তোমার হাতে,’ রবিন বলল। ‘মুসা, ভূতই

মনে হয় গতরাতে আমাদেরকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে ফেলেছিল ওখানে, কোন একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে...”

‘ধাত, সব বাকে কথা,’ হাত নেড়ে মাছি তাড়াল যেন জিন। ‘চলো, গিয়ে পুলিশকে জানাই। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে তাদের।’

‘হ্যা, ঠিকই বলেছ,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ‘ছুটিতে এসেছি আনন্দ করতে, ডাকাত-টাকাতের ঘপ্পরে পড়তে চাই না।’ ম্যাপ বের করে নীরবে দেখল মানিটোনেক। ‘এই থানা-টানা থাকলে এখানেই থাকবে।’

উঠল ওরা। খুশি হলো রাফিয়ান। নাস্তাৰ পৰ পৰই এত সময় ধৰে বসে দাকাতী মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না তাৰ। লাকাতে লাকাতে আগে আগে চলল সে।

‘পা তো একেবাৰে ভাল,’ ছুটিটা মাটে মারা যায়নি বলে রবিনও খুশি, ‘ভালই হয়েছে, শিক্ষা হয়েছে একটা। বোকাৰ মত আৰ খৰগোশেৰ গত্তে ঢুকবে না।’

হ্যা, সত্তাই শিক্ষা হয়েছে রাফিয়ানেৰ। আৱ গত্তে ঢুকল না। তবে পৰেৱ আধ ঘণ্টায় অন্তৰ ডজনখানেক বাৰ মুখ ঢোকাল খৰগোশেৰ গত্তে। ধৰা তো দূৰেৱ কথা, ঝুটেও পাৰল না কোনটাকে। ওৱ চেয়ে খৰগোশেৰ পাল অনেক দেশি ত্যাদড়।

খোলা মাটে বুনো ঘোড়া চৰছে।

একবাৰ একটা পাহাড়ী পথে মোড় নিতেই মুখোমুখি হয়ে গেল একপাল বুনো পাহাড়ী। অবাক দোখ মেলে অভিযাত্রীদেৱ দেখল। তাৰপৰ একই সঙ্গে ঘুৰে ঘুৰেৱ খাটক তুলে স্মৃত হাৰিয়ে গেল পাহাড়ীৰ ঢালেৰ বানে। পিছু নেয়াৰ জন্যো পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান, জোৱ কৰে তাৰ গলার বেল্ট টেনে ধৰে রাখল তিন্নী।

‘বুৰু সুন্দৰ, না?’ বলল সে। ‘আদৱ কৰতে ইচ্ছে কৰে।’

পতন্দিনোৱ মতই সকালটা সুন্দৰ, বোদে উজ্জ্বল। পায়েৱ তলায় সবুজ ঘাস। একটা ঝৰ্নাৰ পাড় দিয়ে হাঁটছে এখন। মনু বিৱৰিব কৰে বইছে টলটলে পানি, যেন পান শেয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছে মাতোয়াৰা হয়ে।

দুপুৰেৱ দিকে জুতো খুলে ঝৰ্নায় পা ডুবিয়ে বসল ওৱা। পায়ে হালকা পালকেৱ মত পৰল বোলাচ্ছে পানি।

সাওউইচ দিয়ে দুপুৰেৱ খাওয়া সেৱে পেট পুৱে খেলো ঝৰ্নাৰ পানি।

পানিতে পা রেখেই নৰম ঘাসে চিত হয়ে গয়ে পড়ল জিন। খোলা নীল ধাকাশেৱ দিকে তামাটো চোখ। হলুদ বোদে যেন জুলাছে তামাটো চুল। বুৰু সুন্দৰ গাগাহে তাকে

কিছুক্ষণ বিশ্বামীৰ পৰ আবাৰ লক্ষ হলো চলা।

ডিয়াটোতে কল্পন পৌছবে জানে না। তবে তাড়াও নেই। সাঁৰেৱ তাঁগে কোন গার্মিটাইস বুজে পেলেই হলো। বালে থাকা-খাওয়াৰ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

‘থানা থাকলে স্মটা বুজে বেৱ কৰতে হচ্ছে আগে,’ বলল কিশোৱ। ‘তাৰপৰ গাঁথী।’

চতুর্থ

ডিয়াটোতে থানা আছে। ছোট থানা, একজন মাত্র ধামুকী। আশপাশের ঢারটে গায়ের দায়িত্বে রয়েছে সে, ফলে নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট না ভাবলেও বেশ দামী লোক মনে করে। শেরিফ হলে কি করত কে জানে।

ধামুকী সাহেবের বাড়িটাই থানা। আরামে বসে ডিনার খাচ্ছে, এই সময় এসে হানা দিল অভিযাত্রীরা। লোডনীয় সঙ্গে আর তাজা কাটা পেয়াজপুলোর দিকে তাকিয়ে উঠে এল বিবর্ক হয়ে।

‘কি চাই?’ কম-বয়েসীদের দু-চোখে দেখতে পারে না লোকটা। তার মতে, সব হেলেমেহেই বিছু, গোলমাল পাকানোর ওপ্পান। কিশোর-বয়েসীগুলোর বেশি ইবলিস।

‘অস্তুত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে, স্যার,’ ভদ্রভাবে বলল কিশোর। ‘ভাবলাম, শেরিফকে জানানো দরকার। আপনি কি শেরিফ?’

‘আঁ... হ্যাঁ, না না, কি বলবে বলো জলদি।’

‘গতরাতে একজন কয়েদী পালিয়েছিল।’

‘মারেছে,’ বলে উঠল লোকটা, ‘তুমিও দেখেছ বলতে এসেছ। কতজন যে এল, সবাই নাকি দেখেছে। একজন লোক একসঙ্গে এতগুলো জায়গায় যায় কি করে, ইশ্বরই জানে।’

‘আমি না,’ শাস্ত্র রাইল কিশোর, ‘আমার এই বন্ধ। পত্রাত সত্ত্ব দেখেছে। একটা মেসেজ নিয়ে এসেছিল লোকটা।’

‘তাই নাকি?’ তবল কষ্টে বলল ধামুকী। ‘তোমার বন্ধ তাইলে আরেক কাটি বাড়া। তবু দেখেইনি, মেসেজও পেয়েছে। তা মেসেজটা কি? সুর্গে যাওয়ার ঠিকানা?’

অনোক কষ্টে কষ্টস্বর স্বাভাবিক রোখে বলল মুসা, ‘টি-ট্রীজ, ব্লাক ওয়াটার, ওয়াটার ব্যের, টিকসি চলোঁ।’

‘বাহ, বেশ ভাল ছন্দ দেন,’ বাস্ত করল ধামুকী। ‘টিকসি জানে। তাহলে টিকসিকে শিয়ে বলো, কি কি জানে এসে বলে যেতে আমাকে। তোমাদের আরেক বন্ধ বুঝি?’

‘না, তাকে চিনি না,’ অপমানিত বোধ করছে মুসা। কড়া জবাব এসে যাচ্ছিল মুখে, কোনমতে সামলাল। ‘আমার জানাবও কথা নয়, যদি না লোকটা এসে বলত। ভাবলাম, বুঝতে পারে এমন কাউকে জানিয়ে যাই। এই যে, এই কাগজটা দিয়েছিল।’

কেড়া পাতাটা হাতে নিয়ে দুর্বোধ আঁকিনুকির দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল গ্রামজী। ‘আরে, আবার কাগজও দিয়েছে। কি লেখা?’

‘আমি কি জানি?’ হাত ওল্টালো মুসা। আর সহ্য করতে পারছে না। ‘সে-জনেই তো আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে ভেবে।’

‘কয়েকী ধরা?’ কুটিল হাসি ফুটল লোকটার মুখে। ‘এত কিছু জানো, আব
গামল কথাটা জানো না? কয়েকী ব্যাটা ধরা পড়েছে হস্টাচারেক আগে। ঘোড়ার
গাল পাল্টে গেল, হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়েছে চেহারা থেকে। ‘আব শোনো,
গুণ্ঠাকরাদের ডেপোমি আমি সইতে পারিন না। আব কক্ষণো...’

‘ডেপোমি করছি না, সাব,’ কালো হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। ‘সত্তি-মিথো
গামার ক্ষমতা নেই, চোর খরেন কি করে?’

গামে গোলাপী হয়ে গেল ধামরক্ষীর গাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না।
‘আব মথের ওপর এভাবে আব কখনও বলেনি কেউ। দেখো খোকা...’

‘খামি খোকা নই। বয়েস আরেকট বেশি।’

‘চুই মেরে বসবে যেন ধামরক্ষী, এত রেগে গেল।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লোকটার প্রায় নাকের নিচে ঠেলে দিল
কিশোর। ‘নিন, এটা পড়লেই অনেক ক্রিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

বিদের সই আব সৌল দেখেই চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল ধামরক্ষীর, সামলে
গাল নিজেকে। কাগজটা নিয়ে পড়ল। লেখা আছে :

এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে
সহায়তা করছে। একে সাহায্য করা মানে পক্ষান্তরে
পুলিশকেই সাহায্য করা।

—ইয়ান ফ্রেচার
চীফ অভ পুলিশ
লস অ্যাঞ্জেলেস।

মুখ কালো করে কাউটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল ধামরক্ষী, ‘তা এখন কি করতে হবে
খামাকে? রিপোর্ট লিখে নিতে হবে?’

‘সেটা আপনার ইচ্ছে,’ ঝাল ঝাড়ল কিশোর।

‘ঠিক আছে, লিখে নিছি,’ পকেট থেকে নোটবই বের করল ধামরক্ষী, নিতান্ত
ধানাঢ়াসদ্রেও। ‘তবে হিশিয়ার করে দিছি, এটা তোমাদের রকি বীচ নয়। এখানকার
গাল ছ্যাচোড়া অন্যরকম। গলাকাটা ডাকাত। ওদের সঙ্গে গোলমাল করতে
গালে বিপদে পড়বে।’

‘সে-ভয়েই বুঝি কেঁচো হয়ে থাকো, ব্যাটা,’ বলার খুব ইচ্ছে হলো
কিশোরের। বলল, ‘সেটা দেখা যাবে। দিন, আমাদের কাগজটা দিন।’

কয়েকজন কিশোরের কাছে হেরে গিয়ে মেজাজ খিচড়ে গেছে ধামরক্ষীর, কি
কামল কে জানে, দুই টানে ফড়াত ফড়াত করে চার টুকরো করে ফেলল মেসেজটা,
গাল দিল মাটিতে। বলল, ‘রিপোর্ট লেখা দরকার, লিখে নিয়েছি। কিন্তু বাজে
কাগজ ছেড়ার জন্মে কুটোও করতে পারবে না কেউ আমার,’ বলে নাক দিয়ে বিচ্ছি
ণৎ করে, পটমট করে চলে গেল ঘরের দিকে।

‘আন্ত ইতো! লোকটা ওনল কিনা, কেয়ারই কৰল না জিনা। ‘এমন কৰল কেন?’

‘লোকটাকেও দোষ দিতে পাৰি না,’ কাগজেৰ টুকুৱোডলো কুড়িয়ে নিষ্ঠে মুসা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোৱ। ‘যা একখন গৱ এসে বলেছি, বিশ্বাস কৰবে কি? ওৱা জায়গায় আমি হলেও কৰতে চাইতাম না। এদিকেৱ গায়েৱ লোক এমনিতেই বানিয়ে কথা বলাৰ ওশুদ্ধ।’

‘তবে একটা সুখবৰ দিয়েছে,’ রবিন বলল, ‘কয়েদী ধৰা পড়েছে। ডাকাতটা ছাড়া থাকলে বনেবাদাড়ে ঘুৰে শাস্তি পেতাম না, মন খচখচ কৰতই।’

‘ভাবতে হবে,’ কিশোৱ বলল। ‘তবে আগে খাবাৰ ব্যবস্থা কৰা দৰকাৰ। এখানে অনেক ফার্মহাউস আছে, দেখা যায়।’

শামৰক্ষীৰ বাড়িৰ কাছ থকে সৱে এল ওৱা। ছোট একটা মেয়েকে দেখে জিজেস কৰল, এমন কোন ফার্মহাউস আছে কিনা, যেখানে খাবাৰ কেনা যায়।

‘ওই তো, পাহাড়েৰ মাথায় একটা,’ হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। ‘আমাৰ দাদুৰ বাড়ি। দাদী বুৰ ভাল, গিয়ে চাইলৈই পাৰে।’

‘থ্যাংকস,’ বলল কিশোৱ।

ঘুৰে ঘুৰে পাহাড়েৰ ওপৰ উঠে গেছে পথ। বাড়িৰ কাছাকাছি হতেই কুকুৰেৰ ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠৈৰ রোম খাড়া হয়ে গেল রাফিয়ানেৱ, চাপা গৌ গৌ কৰে উঠল।

‘চুপ, রাফি,’ মাথায় আলতো চাপড় দিল জিনা। ‘খাবাৰেৰ জনো এসেছি এখানে। ওদেৱ সঙ্গে গোলমাল কৰবি না।’

বুকল রাফিয়ান। রোম স্বাভাৱিক হয়ে গেল আবাৰ, গৌ গৌ বক্ষ। রেগে ওঠা কুকুৰদুটোৰ দিকে বক্ষ সুলভ চাহনি দিয়ে তাৰ ফোলা লেজটা চুকিয়ে নিল দুই পায়েৱ ফাঁকে।

‘এই, কি চাও?’ ডেকে জিজেস কৰল একজন লোক।

‘খাবাৰ,’ চেঁচিয়ে জবাৰ দিল কিশোৱ। ‘ছোট একটা মেয়েকে জিজেস কৰেছিলাম, সে বলল এখানে পাওয়া যাবে।’

‘দাঢ়াও, মাকে জিজেস কৰি,’ বলে বাড়িৰ দিকে চেয়ে ডাকল লোকটা, ‘মা? মা?’

সাংঘাতিক মোটা এক মহিলা বেৰিয়ে এলেন, চঞ্চল চোখ, আপেলেৰ মত টুকটুকে গুল।

‘খাবাৰ চায়,’ ছেলেদেৱ দেৰিয়ে বলল লোকটা।

‘এসো,’ ডাকলেন মহিলা। ‘এই চুপ, চুপ,’ নিজেদেৱ কুকুৰডলোকে ধমক দিলেন।

দেখতে দেখতে কুকুৰদুটোৰ সঙ্গে বক্ষতৃ কৰে ফেলল রাফিয়ান। ছোটাখুটি খেলা ওক্ত কৰল।

বেশ ভাল খাবাৰ। পেট ভৰে খেলো অভিযাত্ৰীৱা। রাফিয়ান তো এত বেশি গিলেছে, নড়তে পাৱছে না, খালি হাসফাস কৰছে।

ওবা থাবাৰ টেবিলে থাকতেই সেই ছোট মেয়েটা এসে ঢুকল। 'হাই, হাসল

নাম? 'বলেছিলাম না, আমাৰ দাদী বুব ভাল। আমি নিনা। তোমৰা?'

বলে একে নাম বলল কিশোৱ। তাৰপৰ বলল, 'ছুটিতে ঘূৰতে এসেছি। বুব
নাম? কিন্তু তোমাদেৱ অঞ্চলটা। কয়েক জায়গায় তো ঘূৰলাম, বেশ ভাল
নাম। আচ্ছা, টু-ট্ৰীজ্জটা কোথায় বলতে পাৰো?'

মাধ্যা নাড়ুল মেয়েটা। 'আমি জানি না। দাদীও, দাদীকে জিজেস কৰি। দাদী?
ন দাদী?'

মুজায় উকি দিলেন মহিলা। 'কি?'

'টু-ট্ৰীজ? বুব সুন্দৰ জায়গা। এখন অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। একটা হৃদেৱ ধাৰে,
মাঝা জোয়াপ। হৃদটাৰ নাম যে কি...কি...'

'ম্যাক ওয়াটাৰ?' কিশোৱ বলল।

'হা। ইয়া, ম্যাক ওয়াটাৰ। ওখানে যাচ্ছে নাকি? বুব সাৰধান। আশেপাশে
আপন, জলা...তো, আৱ কিছু লাগবে-টাগবে?'

'ম্যারিকোপৰে। আৱও? না, না,' হাসল কিশোৱ, 'পেট নিয়ে নড়তে পাৰছি
না। খুব ভাল রেখেছেন। বিলটা যদি দেন। আমাদেৱ এখন যেতে হবে।'

গিল আনতে চলে গেলেন মহিলা।

নিউ গলায় জিজেস কৰল মুসা, 'কোথায় যেতে হবে? ম্যাক ওয়াটাৰ?'

'হা। না কিছুই বলল না কিশোৱ, নিচেৱ ঠোটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে
বলল তবু, 'কালোপানি।'

আত

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে বলল কিশোৱ, 'টু-ট্ৰীজ কতদূৰে, সেটা আগে জানা
পৰাকৰা। স্মৃত হলে আজই যাৰ, নইলে কাল। বেলা এখনও আছে।'

'কতদূৰে সেটা, কি কৰে জানছি?' বলল মুসা। 'ম্যাপ দেখে বোৰা যাবে?'

'মাদ মাপে থাকে। থাকাৰ তো কথা, হৃদ যখন।'

উপত্যকায় নেমে এল আবাৰ ওৱা। রাস্তা থেকে দূৰে নিৰ্জন একটা জায়গা
থাকে নামে বসল।

ম্যাপ বেৰ কৰে বিছাল কিশোৱ।

মানজনিই বুঁকে এল ওটাৰ ওপৰ।

গীৱাব আগে বাবৈন্দৰ চোখে পড়ল। ম্যাপেৰ এক জায়গায় আঙুলেৰ খোচা
মাদে বলল, 'এই যে, ম্যাক ওয়াটাৰ।...কিন্তু টু-ট্ৰীজ তো দেখছি না।'

'ম্যাপ হয়ে গেলে সেটা আৱ ম্যাপে দেখানো হয় না, যদি কোন বিশেষ জায়গা
না হয়। ম্যাক, ম্যাক ওয়াটাৰ তো পাওয়া পেল। তো, কি বলো, যাৰ আজ? কত
দূৰে, কুন্তু পাৰছি না।'

'ম্যাক কাজ কৰলে পাৰি,' জিনা প্ৰস্তুত দিল। 'পোস্ট অফিসে খোজ নিলে পাৰি,
জায়গামা-নে কাছে। সব জায়গায়ই চিঠি খিলি কৰে, কোথায় কি আছে, সে-ই

সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে।

সবাই একমত হলো।

সহজেই খেজে বের করা গেল পোস্ট অফিস। গায়ের একটা দোকানের এক অংশে অফিস, দোকানদারই একাধিরে পোস্ট-মাস্টার থেকে পোস্টম্যান বৃক্ষ এক লোক, নাকের চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন ছেলেদের দিকে।

‘যুক্ত ওয়াট-ব?’ বললেন তিনি। ‘ওখানে যেতে চাও কেন? সুন্দর জায়গা ছিল এককালে, কিন্তু এখন তো নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘কি হয়েছিল?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘পুড়ে গেছে। মালিক তখন ওখানে ছিল না, তখন দৃঢ়ন চাকর ছিল, এক রাতে হঠাত জুলে উঠল বাড়িটা, কেন, কেউ বলতে পারে না। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকল যেতে পারেনি, পথ নেই। কোনমতে ঘোড়ার ছোট গাড়ি-টোড়ি যায়।’

‘আর ঠিক করা হয়নি, না?’

‘না,’ মাথা নাড়লেন বৃক্ষ। ‘বাকি যা ছিল, ওভাবেই পড়ে থাকল। এখন ওটা দাঢ়ুকাক, পেঁচা আর বুনো জানোয়ারের আভড়া। অন্তত জায়গা, ভূতের আশুন নাকি দেখা যায়। গিয়েছিলাম একদিন দেখতে। আতুন দেখিনি, তবে হুদের কালো পানি দেখেছি। যে রেখেছে, একেবারে ঠিক নাম বেখেছে।’

‘কদ্দুর?’ যেতে কতক্ষণ লাগবে?’ জিজ্ঞেস করল জিনা।

‘ওরকম একটা জায়গায় কেন যেতে চাও? হুদের পানিতে গোসল করতে? পারবে না, পারবে না, নামলে জমে যাবে। ভীষণ ঠাও।’

‘নাম আর বর্ণনা ওনে খুব কৌতুহল হচ্ছে,’ বুবিয়ে বলল কিশোর। ‘কোনদিক দিয়ে যেতে হয়?’

‘এভাবে তো বলা যাবে না। মাপ-টাপ থাকলে দেখে হয়তো...আছে তোমাদের কাছে?’

মাপ ছড়িয়ে বিছাল কিশোর।

কলম দিয়ে এক জায়গায় দাগ দিলেন বৃক্ষ, একটা লাইন আঁকলেন, ‘এখান থেকে শুরু করবে, এখানে।’ একটা ক্রস দিলেন, ‘জায়গাটা। ইশিয়ার, ভয়ানক জলা। এক পা এদিক ওদিক ফেলেছে, হঠাত দেখবে হাঁটি পর্যন্ত ঢুবে গেছে পাকে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতি দেখতে পারবে, এত সুন্দর। হরিণও আছে, ভাল লাগবে তোমাদের।’

‘থাঙ্ক ইউ, সার,’ মাপটা বোল করে নিতে নিতে বলল কিশোর। ‘যেতে কত সময় লাগবে?’

‘এই ঘন্টা দুয়েক। আজ আর চেষ্টা কোরো না, বোধহয় সময় পাবে না। অঙ্ককারে ওপরে যাওয়া?...মরবে?’

‘হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। আবার ধন্বাদ দিয়ে বলল, ‘আপনার দোকানে ক্যাম্পিঙের জিনিসপত্র পাওয়া যাবে? দিনটা তো ভারি সুন্দর গেল, রাতটাও বোধহয় ভালই যাবে। গোটা দুই শতবর্জি আর কয়েকটা কস্তুর ভাড়া নিতে চাই।’

অবাক হয়ে গেছে অন্য তিনজন। কিশোর কি করতে চাইছে, বুকতে পারছে না। হঠাত বাইরে রাত কাটানোর মতলব কেন?

উঠে গিয়ে তাক থেকে রবারের বড় দুটো শতরঞ্জি নামিয়ে দিলেন বৃক্ষ। আর চারটে পুরানো কঙ্কল। 'নাও। কিন্তু এই অঞ্চোবরে ক্যামপিং করবে? ঠাণ্ডায় না মরো।'

'মরব না,' বৃক্ষকে কথা দিল কিশোর।

চারজনে মিলে জিনিসগুলো উছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাইরে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোর, কি করবে?'

'এই একটু খোজাখুজি করব আরাকি,' বলল কিশোর। 'একটা রহস্য যখন পাওয়া গেছে...'

'কিন্তু আমরা এসেছি ছুটি কাটাতে।'

'তাই তো কাটাচ্ছি। রহস্যটা পেয়ে যাওয়ায় সময় আরও ভাল কাটবে।'

কিশোর পাশার এহেন ঘুঁঞ্জির পর আর কিছু বলে লাভ নেই, বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা। অন্ত দুজন কিছু বললাই না। তর্ক করা স্বভাব নয় রবিনের, আর আজাডভেঞ্চার জমে ওঠায় মজাই পাচ্ছে জিনা। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়? টু-ফ্রীজে কিছু ঘটতে যাচ্ছে?'

'এখনি বলা যাচ্ছে না। গিয়ে দেখি আগে। খাবার কিনে নিয়ে যাব। এখন রওনা দিলে পৌছে যাব অঙ্ককারের আগেই। ওখানে কোথাও না কোথাও ক্যাম্প করার জাফণা নিশ্চয় মিলবে। সকালে দেখব কোথায় কি আছে।'

'ওন্তে তো ভালই লাগছে,' কুকুরটার দিকে ফিরল জিনা। 'কি বলিস, রাফি?'

'হড়,' সমবদ্ধারের ভঙ্গিতে লেজ নেড়ে সাথ দিল রাফিয়ান।

'যাচ্ছি তো,' বলল মুসা, 'কিন্তু ধরো, গিয়ে কিছু পেলাম না। তাহলে? এই রহস্য-টিহস্যের কথা...'

'আমার ধারণা, পাবই। যদি না পাই, ক্ষতি কি? ঘুরতেই তো বেরিয়েছি আঘাতা, নাকি? প্রিকনিকের জন্যে ঝ্যাক ওয়াটারের মত জাফণা এখানে আর কটা আছে?'

কুটি, মাঝন, টিনে ভরা মাংস ও বিশাল একটা ছুট কেক কিনে নিল কিশোর। কিছু চকলেট আর বিশুটও নিল।

মালপত্রের বোঝার জন্যে স্কুল ইঁটা যাচ্ছে না, তবে অতটা তাড়াহড়াও নেই। দের। অঁধার নামার আগে গিয়ে পৌছতে পারলাই হলো। দেখতে দেখতে। লেজে।

পাহাড়ের চড়াই-উড়াই, সমতল তৃণভূমি, হালকা জঙ্গল, সব কিছু মিলিয়ে এক খপকপ দৃশ্য। দূরে একদল বুনো ঘোড়া চড়ছে। কয়েকটা চিতল হরিণের সুরোমুখি হলো অভিযাত্রীরা। ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল হরিণগুলো, পরঞ্জেহি ঘূরে দে ছুট।

আগে আগে চলেছে কিশোর, শুর সতর্ক, শুর পোস্টম্যানের হিপিয়ারিকে শুরতু। নায় চলেছে সারাক্ষণ। বার বার ম্যাপ দেরে শিওর হয়ে নিষেছে, ঠিক পথেই রয়েছে। কিন্তু

পাটে বসছে টিকটকে লাল সূর্য। ছুবে গেলেই খড়াস করে নামবে অঙ্ককার, গানকার নিয়মই এই। তবে ভরসা, আকাশ পরিষ্কার, আর শরতের আকাশে

তারাও হয় খুব উজ্জল, তারার আলোয় পথ দেখে চলা যাবে। তবু তাড়াহড়ো
করল ওরা, দিনের আলো থাকতেই পৌছে যেতে পারলে ভাল, দুর্গম পথে
অথবা বুকি নেয়ার কোন মানে হয় না।

ছোট একটা সমভূমি পৈরিয়ে সামনে দেখাল কিশোর, 'জঙ্গল। বোধহয়
ওটাই।'

'হুস কোথায়?' বলল বুবিন। 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। কালো।'

কি করে যেন বুকে গেছে বাফিয়ান, গন্তব্য এসে গেছে। লেজ তুলে সৌজা
সেদিকে দিল দৌড়। ডেকেও ফেরানো গেল না। তার কাও দেখে সবাই হেসে
অস্তির।

আকাবাঁকা পথটা গিয়ে মিশেছে আরেকটা সরু পথের সঙ্গে, তাতে ঘোড়ার
গাড়ির চাকার গভীর খাঁজ। দু-ধারের ঘন আগাছা পথের ওপরও তাদের রাজ্য বিস্তৃত
করে নিয়েছে।

জঙ্গলে ঢুকল ওরা। বন কেটে এককালে করা হয়েছিল পথটা, মানুষের অবস্থা
অবহেলায় বন আবার তার পুরানো স্বতৃ দখল করে নিষ্ঠে।

'আমি আসছি,' ঘোমণা দিয়ে দিয়েছে অঙ্ককার।

ঠিক এই সময় হঠাৎ করেই টু-ট্রাইজের ধ্বংসাবশেষের ওপর এসে যেন হৃমড়ি
খেয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা।

কালো, নির্জন, নিঃসঙ্গ, পোড়া ধ্বংসস্তুপ। ভাঙা দু-একটা ঘর এখনও দাঁড়িয়ে
রয়েছে, জানালার পাল্লা আছে, কাচ নেই, ছাতের কিছু কড়িবাণী আছে, কিন্তু ছাত
নেই। মানুষের সাড়া পেয়ে তীক্ষ্ণ চুম্বকার করে উড়ে গেল দুটো দোয়েল।

বাড়িটা কালো হৃদের ঠিক পাড়েই। নিখর, নিষ্ঠক পানি, সামান্যতম চেউ নেই।
যেন কালো জমাট বরফ...না না, কালো বিশাল এক আয়না।

'মোটেই ভাঙ্গাগছে না আমার,' নাকমুখ কোচকাল মুসা; 'কেন যে এলাম
মরাতে।'

আট

কালোই পছন্দ হলো না জায়গাটা। নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর। মূল বাড়িটা
যেখানে ছিল তার দু-ধারে বিশাল দুটো গাছের পোড়া কাও।

'ওই গাছগুলোর জন্মেই নিশ্চয় নাম রেখেছে টু-ট্রাইজ,' বলল সে। 'এটো
নির্জন হবে, ভাবিনি।'

'নির্জন কি বলছ?' বুবি টৈল মুসা। 'বীতিমত ভৃতুড়ে। গা ছমছম করে।'

সূর্য ডোবার অপেক্ষা যেন ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে
গেল এক অলক বাতাস, হাড় কাপিয়ে দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের।

'এসো,' জরুরী কষ্টে বলল কিশোর, 'রাত কাটিনোর আয়গা খোজা দরকার।'

বিষম বাড়িয়া নীরবে ঢুকল ওরা। দোতলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিচতলার
অবস্থা ও শোচনীয়। তবে এক কোণে শোয়ার ব্যবস্থা করা গেতে পারে। কালো

ছাইচে মাখামারি আখপোড়া একটা কাপেটি এখনও বিজ্ঞানো রয়েছে মেঝেতে, বিরাট একটা টেবিলও আছে।

'বৃষ্টি এলে ওটাতে উঠে বসতে পারব,' টেবিলটা দেখিয়ে বলল কিশোর।
'তবে দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'একেবারেই বাজে জায়গা,' রবিনও মুখ বাঁকাল। 'গুরু! থাকা যাবে না যাবানে।'

'অন্য জায়গা খৌজা দরকার,' কিশোর বলল। 'অঙ্ককারও হয়ে এসেছে। আগে লাকড়ি নিয়ে আসি, আগুনের ব্যবস্থা করে, তারপর...'

জিনাকে রেখে লাকড়ি আনতে বেরোল অন্য তিনজন। তরুনো ডালের অভাব নেই। তিন আঁটি লাকড়ি নিয়ে ফিরে এল ওরা।

জিনা বসে থাকেনি। থাকার জন্যে আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করে ফেলেছে, পদমটার চেয়ে ভাল।

ছেলেদের দেখাতে নিয়ে চলল সে। রাঙাঘরের এক ধারে মেঝেতে একটা দরজা, পান্তা তুলে রেখেছে জিনা, নিচে ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

'ভাঙ্ডারে গিয়েছে,' সিঁড়ি দেখিয়ে বলল জিনা।

'জুকেছিলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, অনুমান। নিচে নিশ্চয় আগুন ঢুকতে পারেনি, ছাই থাকবে না। ওপরের ধরের চেয়ে ওখানে ভাল হবে। থাকতে পারব।'

টু জুলে নামতে তরু করল কিশোর, পেছনে অনোরা। রাফিয়ান চলেছে তার পাশে পাশে।

কফেক সিঁড়ি বাকি থাকতেই এক লাফে গিয়ে মেঝেতে নামল কুকুরটা। ওপরেরটা র চেয়ে অনেক ভাল ঘর। বিদ্যুতের তার, বোর্ড, সকেট, সুইচ সবই লাগানো আছে। জেনারেটর ছিল, বোঝাই যায়।

চোট ঘর। মেঝেতে পোকার খাওয়া কাপেটি। ঘুণে ধুরা আসবাবপত্রে ধূলোর পৃষ্ঠ আকৃতি। ভাঙ্ডার-কাম-বসার ঘর ছিল এটা। সারাঘরে মাকড়সার জাল, গালে লাগতেই পাবা দিয়ে সরাল জিনা।

তাকে কিছু মোমবাতি পাওয়া গেল। ভালই হলো। অঙ্ককারে থাকতে হবে না।

লাকড়ি এনে ঘরের কোণে জড়ে করে রাখা হলো।

আসবাবিত্তলো কোন কাজের নয়। ঘুণে খেয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছিল মুসা, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ওটা। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে চিতপটাং হলো গোয়েন্দা-সহকারী। হেসে উঠল সবাই।

তবে টেবিলটা মোটামুটি ঠিকই আছে। ধূলো পরিষ্কার করে ওটার ওপর রাখা হলো খাবারের প্যাকেট।

গাইরে অঙ্ককার। চাঁদ ওঠেনি। শরতের তরুনো পাতায় মর্মর তুলে ঘূরেফিরে গাইছে বাতাস, কিন্তু কালো হুদটা আগের মতই নিখর। ছলছলাত করে তীরে আছড়ে পড়ছে না চেউ।

ঁড়ারে আলমারিও আছে একটা। খুলে দেখল কিশোর। 'আরও মোমবাতি, বাহ, চমৎকার। প্লেট...কাপ...এই, কুয়া-টুয়া চোখে পড়েছে কারও? খাবার পানি লাগবে।'

না, কুয়া দেখেনি কেউ। তবে রবিন একটা জিনিস দেখেছে, ওপরে ঝাম্বাঘরের এক কোণে, সিংকের কাছে। 'বোধহয় পাস্প,' বলল সে। 'চলো দেখি, ঠিক আছে কিনা।'

মোমবাতি জ্বেল ওপরে উঠে এল সবাই। ঠিকই বলেছে রবিন। পাস্প-ই। ট্যাংকে পানি তোলা হত হয়তো। বড় সিংকের ওপরে কলও আছে, ট্যাংক থেকেই পানি আসত।

হাতল ধরে ঠেলে জোরে জোরে পাস্প করল রবিন। কলের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে এল পানি, ডিজিয়ে দিল বহুদিনের শুকনো সিংক।

রবিনকে সরিয়ে হাতল ধরল মুসা। পাস্প করে চলল। অনেক ঘৃহৰ পর আবার পানি উঠেছে ট্যাংকে। খুলো-ময়লা আৱ মৱচে মিশে কালচে-লাল হয়ে কলের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে পানি। খুয়ে পরিষ্কার হতে সময় লাগবে।

একনাগাড়ে পাস্প করে চলেছে মুসা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে পানি।

একটা কাপ খুয়ে পানি নিল তাতে কিশোর। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, লালচে রঙ রঞ্জেছে সামান্য। তবে সেটা কেটে গেলে শুটিকের মত হয়ে যাবে। চুম্বক দিয়ে দেখল। 'আহ, দারুণ। একেবারে যেন ফ্রিজের পানি।'

থাকাৰ চমৎকার জায়গা পাওয়া গেছে, খাবার পানি মিলেছে, আৱ খাবার তো সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে। মোমবাতি আৱ লাকড়ি আছে প্রচুৱ। আৱ কি চাই? বিছানা পেতে আৱাম করে জাঁকিয়ে বসল ওৱা।

'কিসে পেয়েছে কারও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এই মুসা, খাবে?'

'আশুরুই পেয়েছে, আৱ ওৱ পাবে না?' হেসে বলল জিনা।

কিছু কৃতি, মাৰ্বল আৱ এক টিন গোশত খুলে নিয়ে বসল ওৱা। খেতে খেতেই আলাপ-আলোচনা চলল, আগামীদিন কি কি কৰবে।

'কি বুজছি আসলে আমৱা?' জানতে চাইল রবিন। 'কিছু লুকানো-টুকানো আছে ভাবছ?'

'হ্যা,' অবাৰ দিল কিশোর। 'কি আছে, তা-ও বোধহয় আন্দাজ কৰতে পাৱছি।'

'কী?' একই সঙ্গে প্ৰশ্ন কৰল তিনজন।

'ধৰি, দলেৱ নেতা জেৱি। সে বয়েছে জেলে। তাৱ যে বন্ধু পালিয়েছিল, তাৱ কাছে একটা মেসেজ দিয়েছে অন্য দুই বন্ধু বা সহকাৰীকে দেয়াৰ জন্মে। সেই দুজনেৰ একজন হলো ডারাটি রবিন, অন্যজন টিকাসি।'

'ধৰা যাক, বেশ বড় ধৰনেৰ একটা ডাকাতি কৰেছে জেৱি,' একে একে তিনজনেৰ মুখেৰ দিকে তাকাল কিশোৰ, আস্তে সামনে কুকে এসেছে ওৱা। বাফিয়ানও যেন গভীৰ আগ্রহে বনছে, এমনি ভাৰসাৰ, জিনার গী ঘৰেৰ বয়েছে। 'কি

ডাক্তাই করেছে, জানি না, তবে সম্ভবত গহনা। টাকাও হতে পারে। সেগুলো
লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলে তারপর বের করবে। যে
কাগজেই হোক, ডাক্তাইর পর পরই ধরা পড়ে কয়েক বছরের জন্যে জেলে গেছে
সে। ডাক্তাইর মাল কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলেনি পুলিশকে। কিন্তু পুলিশ
ঠাণ্ডবে কেন? যেভাবেই হোক, কয়েদীর মুখ থেকে কথা আদায় করবেই। সেটা
গুরুতে পেরেছে জেরি। কি করবে সে-ক্ষেত্রে?

'জেল-পালানো বন্ধুর কাছে মেসেজ দিয়ে দেবে,' বলল রবিন, 'অন্য দুই
শতকাব্দীকে জানানোর জন্যে, চোরাই মাল কোথায় আছে। পুলিশ আসার আগেই
সেগুলো বের করে নিয়ে চম্পট দেবে ওরা।'

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তাহলে ডাক্তাইদের আগে আমরা খুঁজে বের করব মালগুলো,' জুলজুল করছে
জিনীর চোখ, 'কাল ভোরে উঠেই খোঁজ তরু করব।'

'ও, তাহলে মেসেজের কোড বুঝতে হবে আগে,' বলল মুসা। 'টু-টীজ আব
ওয়াক ওয়াটার তো বুঝলাম। কিন্তু ওয়াটার মেয়ার?'

'জলঘোটকী,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি বললে?'

'আঁ...জলঘোটকী, মানে পানির ঘোঁড়া। বোট...এই কোন নৌকা বা জঙ্গ।'

'ঠিক বলেছ,' জিনী নিয়ে জোরে বাতাস কেপাল জিন। 'যে জন্যে হস, সে
জনো নৌকা। গোসলই যদি না করল, সাঁতার না কাটল আব নৌকা নিয়ে মাছ
ধরতে না গেল, তাহলে এতক্ষণ হদের ধারে কেন বাড়ি করতে যাবে লোকে? নিচয়
একটা বোট আছে কোথাও, তাতে চোরাই মাল লুকিয়েছে ব্যাটোরা।'

'কিন্তু অতি সহজে রহস্য ভেস হয়ে গেল না?' সন্দেহ যাচ্ছে না রবিনের।
'একটা বোটে চোরাই মাল লুকাবে...যে কেউ দেখে ফেলতে পারে বোটটা...
গাঢ়াড়া, মেসেজ লেখা কাগজটায় আঁকিবুকিগুলো কিসের?'

'মুসা,' হাত বাড়াল কিশোর, 'নকশাটা দেবি?'

পকেট থেকে চার টুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে দিল মুসা।

হাসি মুখে ব্যাগ খুলে এক বোল টেপ বের করে দিল জিন। 'নাও, কাজ
লেগেটি গেল। মনে হয়েছিল লাগতে পারে, তাই নিয়েছিলাম।'

'কাজের কাজ করেছ একটা,' কিশোরও হাসল।

টেপ নিয়ে জুড়ে চার টুকরো কাগজ আবার এক করে ফেলা হলো।

'এট যে দেখো,' নকশায় আঙুল রাখল কিশোর, 'এখানে চারটে লাইন
মিশেছে। প্রত্যেকটা লাইনের শেষ মাথায় লেখা...এত অস্পষ্ট করে লিখেছে...'
পুরুষ জালমত দেখে একটা পড়ল সে, 'টিক হিল।...এটা, স্টোপল...'

'আর এটা চিমনী,' রবিন পড়ল তৃতীয় শব্দটা।

'আর এটা হলো টেল স্টোন,' চতুর্থটা পড়ল জিন।

'দল মাথা গরম করে,' হাত জলটাল মুসা। 'বলি, মানে কি এঙ্গলোর?'

'ক্ষু তো একটা নিচয়,' বলল কিশোর। 'শব্দগুলো মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।'

সকাল নামাদ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

নয়

নকশাটা সাবধানে ভাঁজ করে নিজের কাছে রেখে দিল কিশোর।

'আরেকটা অংশ কিন্তু আছে টিকসির কাছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'সেটা ছাড়া সমাধান হবে?'

'হতেও পারে,' বলল কিশোর। 'হয়তো তার কাছেও এটাৰই আৱেক কপি পাঠানো হয়েছে।'

'তাহলে তো সে-ও খুজতে আসবে এখানে,' বলল জিন।

'এলে আসবে,' মুসা বলল। 'লুকিয়ে থাকব।'

'তারও দৰকাৰ নেই,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমাদেৱ কাছে নকশা আছে জানছে কি কৰে? দেখে ফেললে বলব, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।'

'তাৰপৰ চোখ বাখব তাৰ ওপৰ,' হাসল রবিন। 'বৈটি অস্বীকৃতি বোধ কৰবে না?'

'কুলে কুলক, আমাদৈৱ কি...' কথা শেষ না কৰেই চুপ হয়ে গেল মুসা, কিশোৱের মুখেৰ দিকে তাকিয়ে।

গভীৰ হয়ে গেছে গোফেন্সপ্রধান। চিঞ্চিত ভঙ্গিতে বলল, 'টিকসি একা আসবে বলে মনে হয় না। হয়তো ডারটিকে নিয়েই আসবে। ডারটিৰ কাছে মেসেজ নেই তো কি হয়েছে? টিকসিৰ কাছে আছে। একই মেসেজ হলে ওই একটাতেই চলবে। ডারটি যদি ওদেৱ সহকাৰী হয়, কিছুতেই তাকে ফেলে আসবে না টিকসি।'

'ইয়া, তাই তো,' মাথা দোলাল রবিন। 'আৱ ডারটি মেসেজ পায়নি ওনলে সন্দেহ জাগবে। ইশিয়াৰ হয়ে যাবে।'

'তাৰ মানে যতটা সহজ মনে হয়েছিল,' হাই তুলতে তুলতে বলল রবিন, 'তত সহজ নয় ব্যাপারটা...এহ, কতড় ঘূৰ পেয়েছে। যাই, তয়ে পড়ি।'

মুসা ও হাই তুলল। 'আমিও যাই।'

যাব যাব বিছানায় তয়ে পড়ল মুসা আৱ রবিন। ওদৈৱ কাছ থেকে দূৰে ঘৰেৱ এক কোণে বিছানা পাতল জিন। তয়ে পড়ল। তাৱ পায়েৱ কাছে রাফিয়ান।

একটা রেখে বাকি মোমঙ্গলো নিভিয়ে তয়ে পড়ল কিশোৱও।

দেৰতে দেৰতে ঘূৰিয়ে পড়ল চারজনেই।

লম্বা হয়ে তয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই নড়েচড়ে উঠছে।

একবাৱ মৃদু একটা শব্দ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। নাক উঁচু কৰে বাতাস পঞ্চল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়িৰ কাছে। একটা ফাটলে নাক নিয়ে গিয়ে পঞ্চল, পৰম্পৰণেই শান্ত হয়ে ফিরে এল আগেৱ জায়গায়। সাধাৰণ একটা বাঙ।

মাৰুৱাতেৱ দিকে আবাৱ মাথা তুলল সে। ওপৰে রামাঘৰে খুটুখাটি শব্দ হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এল ওপৰে। চাঁদেৱ আলোয় পান্নাৰ মত জুলে উঠল তাৱ

মন্তব্য চোখ।

মুক্ত চলে যাচ্ছে একটা জানোয়ার। রোমশ মোটা লেজ। শেয়াল। কুকুরের
গাঁথ পেয়েই পালাচ্ছে।

সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ বসে বসে পাহাড়া দিল রাফিয়ান। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল
যাবাব।

গলে গলে শেষ হয়ে গেছে মোমটা। ঘর অঙ্কুরার। অংশের ঘুমোচ্ছে সবাই।
কিন্তু পায়ের কাছে এসে আবার উয়ে পড়ল সে।

*
শাবান ধাগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। শক্ত মেঝেতে উয়ে পিঠ ব্যাখ্যা হয়ে গেছে। চোখ
মেঝে পথমে বুবাতে পারল না কোথায় আছে, আন্তে আন্তে সব মনে পড়ল।
গুপ্তাটকে ঢেকে তুলল সে।

‘চোটাইড়া করে হাতমুখ ধুয়ে নাঞ্জা সেরে নিল সবাই। অনেক কাজ পড়ে
থাকে।

হৃদের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ। দুই ধারে নিচু দেয়াল ছিল এক সময়,
এখন পাসে পড়েছে। শেওলায় ঢেকে গেছে ইট। পথ ঢেকে দিয়েছে লতার জঙ্গল,
মাঝে মাঝে ছোট ঝোপঝাড়ও আছে। পথের অতি সামানাই চোখে পড়ে।

শেমনি নিখর হয়ে আছে কালো হৃদটা। তবে তাতে প্রাণের সাড়া দেখা যাচ্ছে
এখন। ওদের দেখে কুকুরে পানিতে ডুব দিল একটা জলমুকুণ্ডী।

‘বোটাইউস্টা কোথায়?’ আনন্দনে বলল মুসা। ‘আছে না নেই, তাই বা কে
আমে।’

হৃদের ধারের পথ ধরে স্মৃত পা চালানোর চেষ্টা করছে ওরা, পারছে না। নানা
ক্ষণ নানা। লতা, ঝোপঝাড় যেন একেবারে পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠে
আসেক টাঙ্গায়। বোটাইউস চোখে পড়েছে না।

এক জায়গায় হৃদ থেকে একটা খাল বেরিয়ে চুকে গেছে জঙ্গলেন মধ্যে।

‘মানুষের কাটা খাল,’ বলল কিশোর। নিচ্য বোটাইউসে নিয়ে যাওয়া
হয়েছে।

বাদের পাড় ধরে এগোল ওয়া। খানিক পরেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, ‘ওই-য়ে!
লাগাপাগায় এমন ঢেকে গেছে, বোঝাই যায় না।’ হাত তুলে দেখাল সে।

দেখন সবাই। সরু হতে হতে এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে খাল। ঠিক
পৰানে খালের ওপর নেমে গেছে সরু লস্তা একটা বাড়ি। লতাপাতা ঝোপঝাড়ে
এমন চোকে যেমনেছে, ভালমত না দেখলে ঠাহরই করা যায় না, ওখানে কোন
গাঁথিগুর আছে।

‘মান হয় ওটাই,’ বুশি হয়ে উঠেছে মুসা। ‘ওয়াটার মেয়ারকে পেলে হয়
এখন।’

‘মা, আর এক জাতের কাটা-গাছই বেশি। ওঙ্গোর ভেতর দিয়ে পথ করে
আগা।’ ‘গায়া কাটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে শরীর, কিন্তু উন্তেজনায় খেয়ালই করছে না
ওরা।

বাড়ির সামনেটা পানির দিকে, ওটাই সদর। একটা চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে পানির ধার থেকে।

ওখান দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু পা রাখতেই ভেঙে পড়ল পচা তক্ক। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ুল সে। না, হবে না এদিক দিয়ে। অন্য পথ খুঁজতে হবে।

অনেক খোজাখুঁজি করেও আর কোন পথ পাওয়া গেল না।

পুরো বাড়িটাই কাঠ দিয়ে তৈরি। শেওলা জমে রয়েছে সবখানে। এক জায়গায় দেয়ালের তক্ক পচে কালো হয়ে গেছে।

লাখি মারল মুসা। জুতোতক্ক পা ঢুকে গেল পচা কাঠে।

চারজনে মিলে সহজেই দেয়ালের তক্ক ভেঙে বড় একটা ফোকর করে ফেলল। আগে ঢুকল কিশোর। অঙ্ককার। বাতাসে কাঠ আর পচা লতাপাতার ভেঙ্গা দুর্ঘন্ত।

চওড়া সিঁড়িটার মাথায় এসে দাঁড়াল সে। নিচে কালো অঙ্ককার পানি, একটা চেউও নেই। ফিরে ডাকল, 'এসো, দেখে যাও।'

সিঁড়ির মাথায় এসে নিচে তাকাল সবাই। আবছা অঙ্ককার। নৌকা রাখাৰ ছাউনি এটা—বোটহাউস। পানির দিকে মুখ, কিন্তু এখন পুরোপূরি খোলা নেই। আগাছা আর লতা অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। ছাঁত থেকে ঝুলছে লতা, নিচের পানির ভেতর থেকে গঁজিয়ে উঠেছে জলজ আগাছা, এবই ফাঁক দিয়ে যতখানি আলো আসতে পারছে, আসছে। তবে অঙ্ককার তাতে কাটিছে না বিশেষ।

চোখে সয়ে এল আবছা অঙ্ককার। দেখতে পাচ্ছে এখন।

'ওই যে নৌকা!' নিচের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'খুঁটিতে বাঁধা। ওই তো, আমাদের ঠিক নিচেই একটা।'

মোট তিনটে নৌকা। দুটো অর্ধেক ডুবে রয়েছে পানিতে, দুটোরই গলুই পানির নিচে।

'তলা ফুটো হয়ে গেছে বোধহয়,' ঝুকে নিচে চেয়ে আছে কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলো ফেলে দেখল বোটহাউসের ভেতরে।

দেয়ালে কোলানো রয়েছে অনেকগুলো দাঁড়। কাতগুলো কালচে থকথকে নরম জিনিস রয়েছে কয়েকটা তাকে, পাটাতনে ফেলে বসার গদি, পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণে একটা নোঙ্গর পড়ে আছে। সিঁড়ির বাতিল সাজানো রয়েছে একটা তাকে। বিষণ্ণ পরিবেশ। কথা বললেই বিছিরি প্রতিখনি উঠেছে।

পরিত্যক্ত বোটহাউস ভূতের বাসা—মনে পড়ে গেল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে। সে-ও টর্চ খুলে নিল। আলো জ্বুলে ভৃত তাড়ানোর ইচ্ছে। নিচু গলায় বলল, 'ওয়াটাৰ মেয়াৰ কোনটা?'

'ওই যে,' একটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলে বলল কিশোর, 'ওয়াটাৰ কি যেন?' কয়েক ধাপ নামল সে। 'ও, ওয়াটাৰ লিল।'

আরেকটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলল মুসা।

‘অকটোপাস,’ বলে উঠল রবিন।

‘বাহু, চম্পকাৰ,’ বলল মুসা। ‘একটাৰ নাম ওয়াটাৰ লিলি, আৱেকটা একেবাৰে
খকটোপাস। মালিকেৰ সাধাৰণ দোষ ছিল।’

‘আৱ ওই যে, ওটাৰ কি নাম?’ তৃতীয় নৌকাটা দেখাল জিনা। ‘ওটাই ওয়াটাৰ
মেয়াৰ?’

দুটো টচেৰ আলো এক সঙ্গে পড়ল নৌকাটাৰ গলুইয়েৰ কাছে। তথু ‘এম’
অফৰটা পড়া যাচ্ছে। সাবধানে আৱও নিচে নামল কিশোৱ। ততো ভেড়ে পানিতে
পড়াৰ ভয় আছে। কুমাল ভিজিয়ে ঘনে ঘনে পরিষ্কাৰ কৱল নামেৰ জায়গাটা।

‘ইঁ,’ বিড়বিড় কৱল কিশোৱ, ‘অকটোপাস, লিটল মাৰমেইড, ওয়াটাৰ
লাল...অকটোপাস, জলকুমাৰী, জলপদু...শিশু, জলঘোটকীও এই পৰিবাৰেৰই
মেয়ে...’

‘অকটোপাসটা ছেলে, না?’ বলল মুসা।

‘কি জানি,’ হাত ওল্টাল কিশোৱ। ‘ওটাৰ মালিকই জানে।’

‘কিন্তু ওয়াটাৰ মেয়াৰটা কোথায়?’ জিনাৰ প্ৰশ্ন।

‘পানিতে ওদিকে কোথাও ডুবে আছে?’ বোটহাউসেৰ মুখেৰ দিকে দেখাল
মুসা।

‘মনে হয় না,’ মাথা নাড়ল কিশোৱ। ‘দেখছ না, পানি কম? ডুবে থাকলেও
দেখা যেত। তলাৰ বালি পৰ্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।’

তবু, আৱও নিশ্চিত হওয়াৰ জন্যে আলো ফেলে দেখল পানিৰ যতখানি চোৰে
পড়ে। আৱ কোন নৌকা নেই এখানে।

‘গেল কোথায় জলঘোটকী,’ নিচেৰ ঠোঁটে চিমটি কাটিতে শুৰু কৱল কিশোৱ।
‘কখন? কিভাবে? কেন?’

বোটহাউসেৰ ভেতৱটা আৱেকবাৰ ভালমত দেখল ওৱা। সিঁড়িৰ কাছে,
বোটহাউসেৰ এক পাশেৰ দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝাড়া কৰে রাখা হয়েছে কাঠেৰ বড়
মাকটা জিনিস।

‘কি ওটা?’ জিনা বলল। ‘ওহহো, তেলা।’

কাছে গিয়ে তেলাটা ভাল কৰে দেখল সৰাই।

‘বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে,’ তেলাৰ গায়ে হাত বোলাল কিশোৱ। ‘ইচ্ছ
কৰাল আমৰা পাঁচজনেই চড়তে পাৰব এটাতে।’

‘দাকুল মজা হবে,’ আনন্দে হাত তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল জিনা। ‘তেলায়
চৰা থা ভান্নাগে না আমাৰ। নৌকাৰ চেয়েও মজাৰ।’

‘নৌকাও একটা আছে অবশ্য,’ কিন্তু ভাৰছে কিশোৱ। ‘ইচ্ছে কৱলে ওটাতেও
চৰা যায়।’

‘খাচ্ছা, তিনটে নৌকাই বুজে দেখলে হয় না?’ প্ৰস্তাৱ দিল মুসা। ‘লুটেৰ মাল
খাচ্ছা কিনা?’

‘দৰকাৰ নেই,’ বলল কিশোৱ। ‘তাহলে জলঘোটকীৰ নাম থাকত না
খাচ্ছা। তোমাৰ সন্দেহ থাকলে গিয়ে বুজে দেখতে পাৰো।’

কিশোর পাশা যখন বলছে নেই, থাকবে না।

'এক কাজ করো,' আবার বলল কিশোর। 'সন্দেহ যখন হয়েছে, গিয়ে খুঁজে দেখো। এসব ব্যাপারে হেলাফেলা করা উচিত নয়। শিওর হয়েই যাই।'

কিন্তু ওঠাটার মেয়ার গেল কোথায়?' বলল সে। 'পরিবারের সবাই খুঁজানে হাজির, আরেকটা গিয়ে লুকাল কোথায়? হদেব তীরে কোথাও লুকানো হয়েছে?'

'হ্যা, তা হতে পারে,' ভেলাটা ছেলেছে কিশোর, ধেমে গেল। 'ডাঙ্গায় না হোক, পাড়ের নিচে কোথাও কোন গলিঘৃষ্টিতে লুকিয়ে রেখেছে হয়তো।'

'চলো- না তাহলে এখনি খুঁজে দেখি,' ভেলায় চড়ার লোভ আপাতত চাপা দিল জিনা।

দেয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। বোটাইসের দুর্গম্ব থেকে দূরে আসতে পেরে হাপ ছেড়েছে। সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে রাফিয়ান। অঙ্ককার ওই ঘরটা ঘোটেও ভাল লাগছিল না তার। এই তো, কি চমৎকার উফ রোদ, কি আরামের বাতাস, লেজের রোম কি সুন্দর ফুলিয়ে দেয় ফুঁ দিয়ে।

'কোনদিক থেকে শুরু করব?' বলল রবিন। 'ভান, না বাম?'

মীরবে পানির ধারে এগিয়ে গেল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। ডানেও তাকাল, খাঁয়েও। কিন্তু কোন দিকেই কোন পার্থক্য নেই, দু- দিকেই সমান ঘন ঝোপবাঢ়।

'পানির কাছাকাছি থাকাই মুশকিল,' বলল কিশোর। 'দেখা যাক তবু। চলো, বাঁ দিক থেকেই শুরু করি।'

শুরুতে জঙ্গল তেমন ঘন নয়, পানির কাছাকাছি থাকা গেল। পানির ওপর ঝুঁকে রয়েছে লতানো ঝোপ, যে কোনটার তলায় লুকিয়ে রাখা যায় নৌকা। উকি দিয়ে, পাড়ের নিচে নেমে, যতভাবে সন্তুষ্ট, নৌকা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল ওরা।

সিকি মাইল পর থেকেই ঘন হতে শুরু করল জঙ্গল। এত ঘন যে পথ করে এগোনোই কঠিন, থাক তো পানির ধারে গিয়ে উকি দেয়া। পানির ধারে মাটি রসাল বলেই বোধহয়, জঙ্গল ওখানে আরও বেশি ঘন।

'নাহ, এভাবে হবে না,' এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'যা কাঁটা। শেষে চামড়া নিয়ে ফিরতে পারব না।'

'হ্যা, কাঁটা বেশিই,' দুই হাতের তালু দেখছে মুসা, কেটে ছেড়ে গেছে, কোন আঁচড়, এত গভীর, রক্ত বেরোচ্ছে। 'ঠিকই বলেছ, এভাবে হবে না।'

অন্য দুজনেরও একই অভিমত। আনন্দ পাচ্ছে শুধু রাফিয়ান। বার বার উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে বনের দিকে। বুঝতে পারছে না যেন, এত সুন্দর কাঁটা আর ঝোপকে কেন পছন্দ করছে না বোকা ছেলে-মেয়েগুলো?

ছেলেরা যখন ফিরল, বীতিমত আহত বোধ করল রাফিয়ান। হতাশ ভঙ্গিতে হেঁটে চাল ওদের পেছনে।

'ভানে চেষ্টা করে দেখব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নাহ লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওদিকে আরও বেশি জঙ্গল। খামোকা সময় নষ্ট। তার তেয়ে এক কাজ করি এসো?...ভেলায় চড়ে ঘুরি?'

'ঠিক বলেছ। দাক্ষণ হবে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল জিনা। 'কষ্টও হবে না, তাছাড়া
পানির দিক থেকে দেখার সুবিধে অনেক। কোন ঘূপচিটই চোখ এড়াবে না। সহজেই
মুক্ত পারব।'

'ইস, আগে মনে পড়ল না কেন?' আফসোস করল মুসা। 'তাহলে তো
মাথাবে হাত-পাঞ্জলো ছুলতে হত না।'

জন্মলের ভেতর দিয়ে আবার বোটাইসের দিকে ঝুওনা হলো ওরা।

হাতাখ থেমে গেল রাফিয়ান। চাপা গর্জন করে উঠল।

'কি হয়েছে, রাফি?' থেমে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল জিনা।

আবার গৌ গৌ করে উঠল রাফিয়ান।

সাবধানে পিছিয়ে গেল চারজনে। একটা ঝাপের ভেতর থেকে মাথা দেব করে
ভাকাল বোটাইসের দিকে। কই, কিছুই তো নেই? এমন করছে কেন তাহলে
রাফিয়ান?

সবার আগে দেখল মুসা। কিশোরের পাঞ্জরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল।

এক তরুণী, আর একটা লোক। কথা বলছে।

'নিশ্চয় টিকসি,' কিসকিস করে বলল কিশোর।

'আব ওই ব্যাটা ভারতি রবিন,' মুসা বলল, 'আমি শিওর।'

দশ

ওই দুজন আসবে, জানাই আছে ছেলেদের, তাই চমকাল না।

'ডারটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি মুসার। রাতে দেখেছে, সকালেও
দেখেছে—চওড়া কাখ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় বাঁকড়া
চুল।' শব্দে, তার বাড়িতে তাকে যেমন লেগেছিল, এখন ঠিক ততটা ভীষণ মনে হচ্ছে
না।

'বে যেয়েমানুষটাকে কেউই পছন্দ করতে পারছে না, একটুও না। পরনে
কোণাকাটা পান্ট, গায়ে বজ্জিনি শার্টের ওপর অঁটসাট জ্যাকেট, চোখে বেমানান
শামের বড় সান্ত্বাস, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। প্রথম কষ্ট শোনা যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ স্বর।

'এ-বেটিই তাহলে টিকসি,' ভাকল কিশোর। 'জেরি ভাকাতকে দেখিনি, তবে
কান্দি মাঙ্গনী জুটিয়েছে ভাকাতটা।'

মাঙ্গাদের দিকে ফিরল গোয়েন্দাপ্রধান। রাফিয়ানের গলার কেলট টেনে ধরে
(১০ মাঝ জিনা, বেরোতে দিচ্ছে না।) 'শোনো,' কিশোর বলল, 'ওদেরকে না চেনার
জন্ম করবে। কথা বলতে বলতে বেরোব আবরা, যেন জঙ্গল দেখতে চুকেছিলাম।
গীর্জাক্ষু জিজ্ঞেস করে, বলবে বেড়াতে এসেছি। উলটো-পালটা যা খুশি বলবে।
গোবাল, 'আমরা মাথামোটা একদল ছেলে-মেরে, মেরে ছুটি কাটাতে এসেছি। আব
(গোবাল) কোন প্রশ্ন যদি করে, চুপ করে থাকবে, আমি জৰাব দেব। ও-কে?'

মাথা বাঁকাল তিনজনেই।

ঝাপের ভেতর থেকে বেরোল কিশোর ছড়মুড় করে। ভাকল, 'মুসা, এসো।

ওই যে, বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। মাই গড়, সকালের চেয়েও খারাপ দেখাচ্ছে এখন।'

জিনা আৰ বাফিয়ান একসঙ্গে লাফিয়ে বেরোল, তাদেৱ পেছনে এল বুবিন।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই ডাকাত। মুগ্ধ কি যেন বলল একে অন্যকে। কুকু
কুচকে তাকাল লোকটা।

বকবক কুতুতে কুতুতে উদেৱ দিকে এগোল ছেলেৱা।

তীক্ষ্ণ কষ্টে জিঞ্জেস কুল মেয়েমানুষটা, 'কে তোমৰা? এখানে কি কুৰছ?'

'কেড়াতে এসেছি,' জবাব দিল কিশোৱ। 'ঘোৱাফেৱা কুৰছি। শুল ছুটি।'

'এখানে কেন এসেছ? এটা প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি।'

'তাই নাকি?' বোকাৰ অভিন্ন উকু কুল কিশোৱ। 'শোড়া, ভাঙাচোৱা বাড়ি,
জঙ্গল... যাৰ খুশি এখানে আসতে পাৰে। আসলে নেকটা দেখতে এসেছি। খুব নাম
হনেছি তো।'

পৰম্পৰেৱ দিকে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদেৱ দেৱে অবাক হয়েছে, বোৰা
যাব।

'কিন্তু এ-হুদ দেখতে আসা উচিত হয়নি,' বলল মেয়েমানুষটা। 'খুব বাজে
জায়গা, বিপদ হতে পাৰে। সীতাৰ কাটা কিংবা নৌকা-চড়া এটাতে নিষেধ।'

'তা-তো বলেনি আমাদেৱকে।' যেন খুব অবাক হয়েছে কিশোৱ। 'নিষিক, তা-
ও বলেনি। আপনাৰা কুল বৰৱ পেয়েছেন।'

'বাহ, কি সুন্দৰ একটা ডাহুক গো!' হাত তালি দিয়ে নেচে উঠল বুবিন। ঢোখ
বড় বড় হয়ে গেছে হুদেৱ দিকে চেয়ে। 'কি ভাল জায়গা। কত জানোয়াৰ আৱ পাখি
যে আছে।'

'বুনো ঘোড়াও নাকি অনেক,' মুসা যোগ কুল। 'গতকালই তো দেখলাম
কয়েকটাকে। খুব সুন্দৰ ছিল, না?'

ছিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত।

কড়া গলায় ধৰ্মক দিল ডারটি, 'চুপ! যত্নোসব! এখানে আসা নিষেধ, তনছ?
ঘাড়ে হাত পড়াৰ আগে কাটো।'

'নিষেধ?' কষ্টস্থৰ হঠাৎ পাল্টে ফেলল কিশোৱ, কঠিন হয়ে উঠেছে চেহাৱা।
'তাহলে আপনাৰা এখানে কি কুৰছেন? আৱ, তম্ভাবে কথা বলুন।'

'তবে রে আমাৰ তম্ভলোক।' চেঁচিয়ে উঠল ডারটি, গেছে মেজাজ খারাপ হয়ে।
শাটেৱ হাতা গোটাতে গোটাতে আগে বাঢ়ল।

বাফিয়ানেৱ বেল্ট ছেড়ে দিল জিনা।

নামনে এগোল কুকুৰটা। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহাৱা, ঘাড়েৱ রোম খাড়া।
চাপা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলার গতীৰে।

চমকে গেল ডারটি। পিছিয়ে গেল আবাৱ। 'ধৰো, কুকুটাকে ধৰো! হাৰামী
জানোয়াৰ।'

'হাৰামী লোকেৱ জন্মে হাৰামী জানোয়াৰই দৰকাৱ,' শান্ত কষ্টে বলল জিনা।
'তুমি যেমন কুকুৰ, ও-ও তেমন মুগ্ধ। তোমৰা যতক্ষণ কাছে-পিছে থাকছ, ওকে
ছেড়ে রাখব।'

চাপা গর্জন করে আরও দুই কদম এগোল রাফিয়ান। চোখে আঙুন।

চেঁচিয়ে উঠল মেয়েলোকটা, 'হয়েছে হয়েছে, রাখো। এই মেয়ে, তোমার
কৃষ্ণাটা ধরো। আমার এই বক্স না... ওর মেজাজ ভাল না।'

'আমার এই বক্সটিরও মেজাজ খারাপ,' রাফিয়ানকে দেখোল জিনা।
'তোমাদের সহিতে পারছে না। ঘাড়ে কামড় দিতে চায়। কতক্ষণ আছ তোমরা?'

'সেটা তোমাকে কলব কেন?' গর্জে উঠল ডারটি।

তার গর্জনের জবাবে ছিঞ্চ জোরে গর্জে উঠল রাফিয়ান। আরেক পা পিছিয়ে
গেল ডারটি।

'চলো, খিদে পেয়েছে,' সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর
ক্ষমতা নেই। আমরা যেমন অন্যের জায়গায় এসেছি, ওরাও এসেছে।'

সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল অভিযাত্রীরা। দুই পা এগিয়ে ফিরে চেয়ে
দাতমুখ খিচিয়ে আরেকবার শাসাল রাফিয়ান, তারপর চলল বক্সদের সঙ্গে।

দুই ডাকাতের চোখে তীব্র ঘৃণা, কিন্তু বিশাল কুকুরটার ভয়ে কিছু করতে পারল
না, দাঁটির আঙুনে ছেলেদের ভয় করার চেষ্টা চালাল শুধু।

ওদেরকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে উনিয়ে উনিয়ে বলল জিনা, 'রাফি,
শেয়াল মাখবি। ব্যাটাটাকে ধরবি আগে।'

পোড়া বাড়িটায় পৌছল ওরা। বলতে হলো না, রাস্তা ঘরের দরজায় পাহারায়
শেল রাফিয়ান। দুই ডাকাতের দিকে ফিরে মুখ তেঙ্গচাল একবার, বুঝিয়ে দিল,
কাছে এলে ভাল হবে না।

ভাঙ্ডারে চুকল অন্তোরা। যেটা যেমন রেখে শিয়েছিল, তেমনিই আছে, কেউ
চাপ দেয়নি।

'চোকেইনি হয়তো এখনও,' বলল কিশোর। 'দেখেনি। যতটা ভেবেছি, তার
মেয়েও বাজে লোক ওই দুটো, টিকসি আর ডারটি।'

'হ্যা,' একমত হলো মূসা, 'জবন্য। মেয়েমানুষটা বেশি খারাপ। চেহারাটাও
আমি কেমন কুক্ষ।'

'আমার কাছে ডারটিকেই বেশি খারাপ লেগেছে,' রবিন বলল। 'আন্ত একটা
গাঁথলা। চুল কাটে না কেন?'

'কি জানি,' একটা কুটির মোড়ক খুলতে শুরু করল জিনা। 'হয়তো ভাবছে
মানুষ চাল-টাল পাবে। টাবজানের বিকৃত সংস্করণ।'

'রাফি না থাকলে কিন্তু বিপদে গড়তাম,' বলল রবিন। 'ও-ই ঠেকিয়েছে
শামিদের।'

'কি করছে ব্যাটারা, দেখে আসা দরকার,' প্রায় অর্ধেকটা পাউরটি আর এক
গাঁথলা মাবন তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মূসা।

শাম মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। কুটি আর মাখন শেষ। 'ব্যাটাকে
পৰ্যাম বোটাহাউসের দিকে যাচ্ছে। ওয়াটার মেয়ারকে বুঁজতে বোধহয়।'

'হ্,' খেতে খেতে বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভালমত ভাবতে
হো। কি করবে ওরা এখন? জানা আমাদের জন্যে খুব জরুরী। হয়তো মেসেজের

পাঠোকার করে ফেলেছে ওরা,' কঠিন শব্দ ব্যবহার করল সে। 'ওদের ওপর চোখ রাখতে হবে। দুর্বল মুহূর্তে কিছু ফাঁস করে দিতে পারে আমাদের কাছে।'

'মেসেজের সঙ্গে যে নকশাটা দিয়েছে জেরি, নিশ্চয় তার কোন মানে আছে,' আপনমনে বলে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছে ডারটি আর টিকসি।' কৃটি চিবাতে চিবাতে ভাবনার অভ্যন্তর তলিয়ে গেল সে। দীর্ঘ নীরবতার পর তেসে উঠল আবার। 'আজ বিকেলেই কিছু একটা করতে হবে আমাদের। ভেলাটা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ব হচ্ছে। যে কোন ছেলেমেয়েই তা করতে পারে, এতে কিছু সন্দেহ করবে না দুই ডাকাত। নৌকাটা খুঁজব আমরা। আর যদি হচ্ছে বেরোয় টিকসি আর ডারটি, একই সঙ্গে ওদের ওপরও চোখ রাখতে পারব।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' আঙুলে চুটকি বাজাল জিনা। 'দারুণ সুন্দর বিকেল। হচ্ছে ভেলা ভাসিয়ে দাঢ় টানা...আউফ! এখনি বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও,' মাথা কাত করল মুসা। 'ভেলাটা আমাদের ভার সইতে পারলেই হয়...জিনা, আরেক টুকরো কেক দাও তো। বিস্তু আছে?'

'অনেক,' জবাব দিল রবিন। 'চকলেটও আছে।'

'বুর ভাল,' এক কামড়ে এক স্নাইস কেকের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে চিবাতে শুরু করল মুসা। 'এখানেই থাকতে হবে মনে হচ্ছে। খাবারে টান না পড়লেই বাঁচি।'

'যে হারে গেলা শুরু করেছ,' জিনা ফোড়ল কাটল, 'শেষ না হয়ে উপায় আছে? বিদেশ-বিভুই, খাবারের সমস্যা আছে, একটু কম করে যাও না বাবা...'

'জিনা,' হাত বাড়াল কিশোর, 'জগটা দাও তো, পানি নিয়ে আস। আর রাফির জন্মে কি দেবে দাও।'

ধীরে সুস্থ পুরো আধ ঘণ্টা লাগিয়ে লাক শেষ করল ওরা। এবার বোটহাউসে শিয়ে ভেলা নিয়ে বেরোনো যায়।

বোট হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।

হচ্ছের দিকে চেয়ে হঠাত বলে উঠল কিশোর, 'দেখো দেখো, ওই ষে। নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে ব্যাটোরা। নিশ্চয় জলকুমারী, ওটাই একমাত্র ডোরেনি। শিওর, জলঘোটকীকে খুঁজছে ওরা।'

দাঁড়িয়ে গেল সবাই। মুসার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। এত কষ্ট কি শেষে মাঠে যাবে? তাদের আগেই ওয়াটার মেয়ারকে পেয়ে যাবে ওই দুই ডাকাত? ওরা কি জানে, নৌকাটা কোথায় লুকানো।

দেয়ালের ফোকর দিয়ে বোটহাউসে চুকল ওরা। সোজা এগোল ভেলার দিকে, ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, লিটল মার্লমেইডকেই নিয়ে গেছে।

ভেলার কোণার চার ধারে দড়ির হাতল লাগানো রয়েছে, ধরে নামানোর জন্মে। চারজনে চারটে হাতল ধরে ভেলাটা তুলে নিয়ে চওড়া সিডি বেয়ে নামতে শুরু করল। সতর্ক রয়েছে, ভাবের চোটে না আবার তেঙ্গে পড়ে পুরানো সিডি।

ভাঙ্গল না। পানির কিনারে চলে এল ওরা।

'এবার ছাড়ো,' বলল কিশোর। 'আস্তে!'

ঘণ্টা পারল আস্তেই ছাড়ল ওরা, কিন্তু ভারি ভেলা। ঝপাত করে পড়ল

পানিতে, পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল ওদের শরীর।

‘দাঢ়ুগুলো খুলে নিয়ে এসো,’ এক কোণার হাতল ধরে রেখেছে কিশোর, নইলে ভেসে যাবে ভেলা। ‘জলনি।’

এগারো

ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের দাঢ়ু ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। ভেলা বাওয়ার জন্মে বিশেষভাবে তৈরি চারটে ছোট দাঢ়ু রয়েছে ওগুলোর মধ্যে। খুলে নিয়ে আসা হলো ওগুলো।

চুপচাপ দাঢ়িয়ে দেখছে রাফিয়ান। কোন কাজে সহায়তা করতে পারছে না। খারাপ লাগছে তার, বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাবেসাবে।

কোণের হাতল ধরেই রয়েছে কিশোর। দাঢ়ু হাতে আগে উঠল মুসা। বালিতে দাঢ়ুর টেকা নিয়ে ভেলা আটকাল। এরপর উঠল জিনা। দুজনেই দাঢ়ু বাওয়ায় ওখাদ। রবিন উঠল। সব শেষে উঠল কিশোর—না না, ডুল হলো, রাফিয়ানের আগে উঠল সে।

‘রাফি, আয়,’ হাত নেড়ে ডাকল জিনা। ‘এ-বকম নৌকায় চড়িসনি আগে, কিন্তু অসুবিধে হবে না। আয়।’

সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পানির কিনারে নেমে এল রাফিয়ান। কালো পানি নঁকল একবার, পচল হচ্ছে না। তবে আর ডাকের অপেক্ষা করল না। মন্ত্র এক লাফ দিয়ে হঠাত করে এসে পড়ল ভেলায়।

জোরে বাঁকি দিয়ে এক পাশে কাত হয়ে গেল ভেলা।

প্রস্তুত আরেক পাশে একেবারে কিনারে চলে গেল রবিন, ভারসাম্য ঠিক করল। তেসে বলল, ‘চুপ করে বোস। যা একথান বপু তোমার, মড়োড়ারই আর জায়গা নাই। ডুবিয়ে মেরো না সক্ষাইকে।’

রাবিনের কথায় কিছু মনে করল না রাফিয়ান। চুপ কর্তৃ স্বস্তি।

বালিতে দাঢ়ুর মাথা ঠেকিয়ে লগি-ঠেলার মত করে ভেলাটিকে বোটহাউস ধাকে বের করে আন। তৎক্ষণাৎ করল মুসা। জিনাও হাত লাগাল। বোটহাউসের মাথার লতাপাতা অনেকখানি পরিষ্কার করে নিয়েছে দুই ডাকাত, নৌকা বের করার পথে, কাজেই ছেলেদের আর কিছু পরিষ্কার করতে হলো না। সহজেই খালে পর্যায়ে এল ওরা।

শাস্তি পানি, ভেলাটাও শাস্তি রইল। চেউ থাকলে অসুবিধে হত, বোকা বেশি।

এক সঙ্গে দাঢ়ু বেয়ে চলল চারজনে।

রাফিয়ান দাঢ়িয়ে দেখছে। ভেলার পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে পানি, এগ মজা পাচ্ছে সে। ভাবছে বোধহয়, এটাও কোন ধরনের নৌকা। সাবধানে আমনের এক পা বাঁকিয়ে পানি ছুল সে, ঠাণ্ডা, সুড়সুড়ি দিল যেন পায়ে। কুকুরে-হাসি হয়ে লম্বা হয়ে ওয়ে পড়ল সে, ভেংতা নাকটা পানি ছুই ছুই করছে।

‘মজার কুকুর তুই, রাফি,’ বলল রবিন। ‘শয়েছিস, ভাল। দেখিস, রাফিয়ে

উঠিস না হঠাতে। ভেলা উল্টে যাবে।'

আলের মুখের দিকে শুনত এগিয়ে চলেছে ভেলা। নৌকাটা দেখা যাচ্ছে না।

'ওই যে,' ভেলা আরও খানিক দূর এগোনোর পর হাত তুলল কিশোর। হদের মাঝেই আছে এখনও নৌকাটা। লিটল মারমেইড। 'পিছু নেব নাকি? দেখব কোথায় যায়?'

'অসুবিধে কি?' বলল মুসা।

জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল সবাই। দুলে উঠল ভেলা।

'আবে, ও কি করছ?' কিশোরকে বলল মুসা। 'উল্টোপাল্টা ফেলছ তো। ভেলা এগোবে না, ঘুরবে খালি। এভাবে ফেলো, এই এভাবে,' দেখিয়ে দিল সে।

যতই দেখিয়ে দেয়া হোক, বিশেষ সুবিধে করতে পারল না কিশোর আর ববিন। বিরক্ত হয়ে শেষে বলল মুসা, 'না পারলে চুপ করে বসে থাকো। আমি আর জিনাই পারব। খালি খালি অসুবিধে করবে আরও।'

সানন্দে হাত শুটিয়ে বসল কিশোর। দাঁড় বাওয়ার চেয়ে মাথা খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। তা-ই করল।

. জিনা আর মুসাও খুব খুশি, মনের মত কাজ পেয়ে গেছে। যেমে উঠছে শরীর। উফ কোমল রোদ, বাতাস নেই, শরতের নির্মল বিকেল।

'দাঁড় বাওয়া বক্ষ করে দিয়েছে,' নৌকাটার দিকে ইশারা করে বলল জিনা। 'খুঁজছে। কিশোর, কি মনে হয়? আমাদেরটার মতই মেসেজ আছে ওদের কাছে? ইস যদি দেখতে পারতাম।'

কিশোরের নির্দেশে দাঁড় বাওয়া বক্ষ করল মুসা আর টিকসি। এতই খুঁকেছে, কপালে কপাল লেগে গেছে প্রায়।

'আন্তে দুই টান দাও তো,' বলল কিশোর। 'আরেকটু কাছে এগোই। দেখি, কি দেখছে ব্যাটোরা।'

নৌকার একেবারে পাশে চলে এল ভেলা। ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান। চমকে মুখ তুলে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে কালো হয়ে গেল মুখ।

'হাল্লো,' দাঁড় তুলে নাড়ল মুসা, হাসি হাসি মুখ। 'চলেই এলাম। খুব ভাল চলছে ভেলা। তোমাদের নৌকা কেমন?'

রাগে লাল হয়ে গেল টিকসির মুখ। চেঁচিয়ে বলল, 'কাকে বলে ভেলা বের করেছ? বিপদে পড়বে।'

'তাই তো জিঞ্জেস করতে এলাম,' কিশোর বলল, 'তোমরা কাকে জিঞ্জেস করে নৌকা বের করেছ। গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসব তার কাছ থেকে।'

হেসে উঠল জিনা, গা জুলিয়ে দিল দুই ডাকাতের।

কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে রাগে ফুলতে শুরু করল টিকসি। ডারটির ভাব দেখে মনে হলো, দাঁড়ই ছুড়ে মারবে কিশোরের মুখে। গর্জে উঠল, 'কাছে আসবি না বলে সিলাম। মেরে তত্ত্ব করে দেব।'

'রাগ করছ কেন, ভাই?' মোলায়েম গলায় বলল মুনা। 'আমরা তো বাগড়া মিটিয়ে ফেলতে এলাম। ভাব করে নেওয়া ভাল না?'

ଆବାର ହେସେ ଉଠିଲ ଜିନା, ବିଛୁଟି ଡଲେ ଲାଗାଳ ଯେନ ଡାକାତଦେର ଚାମଡ଼ାୟ ।

ପାରଲେ ହେଲେଦେର ଏଥିନ ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ କରେ ଛିଡ଼େ ଫେଲେ ଓରା । କିନ୍ତୁ ଶାମଲେ । ୧୦୩ ଟିକସି । ନିଚୁ ଗଲାଯ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ପରାମର୍ଶ କରିଲ ଡାରଟିର ସଙ୍ଗେ । ରାଗେ ବାର ଦୁଇ ମାଥା ଧାକାଲ ପରିଲାଟା, କିନ୍ତୁ ଶେଷେ ମେନେ ନିଲ ଟିକସିର କଥା । ଦାଢ଼ ତୁଲେ ନିଯେ ଝାପାଂ କରେ ଫେଲିଲ ପାରିତେ, ମୁଣ୍ଡ ବୈଯେ ଚଲିଲ ।

‘ଚାଲାଓ,’ ବଲିଲ କିଶୋର । ‘ପିଛୁ ନାଓ,’ ସେ-ଓ ନିକ୍ରିୟ ରଇଲ ନା ଆର, ଅସୁବିଧେ ନା କରେ ଯତଟୁକୁ ସମ୍ବବ ସାହାଯ୍ୟ କରିତେ ଚାଯ ଦାଢ଼ ବାଓଯାଯ ।

ପଞ୍ଚମ ତୀରେ ଦିକେ ନୌକା ନିଯେ ଯାଇଁ ଡାରଟି । ଡେଲାଟାଓ ପିଛେ ଲେଖେ ରଇଲ । ମାନାପଥେଇ ସାଇ କରେ ନୌକାର ମୁଖ ଘୋରାଲ ।

ନୌକା ହାଲକା, ଡେଲା ଭାବି, ଚଲନ ଓ ନୌକାର ଚେଯେ ଭାବି । ଫଳ, ଚାରଜନେ ବୈଯେଓ ଏକଜନେର ସଙ୍ଗେ ତାଲ ରାଖିତେ ହିମଶିମ ଥାଇଁ । ସନୟନ ଓଠାନାମା କରଇଁ ବୁକ ।

ଡାନ ତୀରେ ନୌକା ନିଯେ ଗେଲ ଡାରଟି । ଡେଲାଟା କାହାକାହି ହଓଯାର ଅପେକ୍ଷାଯ ଏଟିଲ ।

‘ଭାଲ ଏକସାରସାଇଜ, ତାଇ ନା?’ ଡେକେ ବଲିଲ ଟିକସି । ‘ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଜନ୍ୟେ ଭାଲ ।’ ଆବାର ହଦେର ମାଦ୍ରାଖାନେ ରାନ୍ଧା ଦିଲ ନୌକା ।

‘ଥାଇଁଛେ!’ ହୁସି କରେ ମୁଖ ଦିଯେ ନିଃଶ୍ଵାସ ଛିଡ଼େ ବଲିଲ ମୁସା । ‘ହାତ ଅବଶ ହୟେ ଥାଇଁ ଆମାର । କି କରଇଁ ବାଟାରା?’

‘ଆମୋକା ଥାଟିଯେ ନିଚ୍ଛେ,’ ଦାଢ଼ ତୁଲେ ଫେଲେଛେ କିଶୋର । ‘ଆମରା ଥାକଲେ ଜଲଘୋଟକୀକେ ଆର ବୁଜିବେ ନା । ଖେଲାଇଁ ଆମାଦେର ।’

‘ତାହଲେ ଆର ଖେଲିତେ ଯାଇଁ ନା ଆମି,’ ବୁଡୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ନାଙ୍ଗୁଳ ମୁସା । ଦାଢ଼ ତୁଲେ ବୋଯେ ଚିତ ହୟେ ବୁଯେ ପଡ଼ିଲ, ହାପାଇଁ ।

‘ଅନୋରା ଓ ବିଶ୍ଵାମ ନିତି ଲାଗିଲ ।

ବନ୍ଦୁଦେର ଅବଶ୍ଵା ଦେଖେ କରଣା ହଲୋ ଯେନ ରାଫିଯାନେର, ଉଠେ ଏସେ ଏକ ଏକ କରେ ଗାଲ ଚେଟେ ଦିଲ ଚାରଜନେରଇ । ତାରପର ଭୁଲ କରେ ବସେ ପଡ଼ିଲ ଜିନାର ପେଟେର ଓପର ।

‘ହେଇ ରାଫି! ଆରେ, ଦୟ ବନ୍ଦ ହୟେ ଗେଲ ତୋ ଆମାର ।’ କୁକୁରଟାକେ ଜୋରେ ଠେଲେ ଦିଲ ଜିନା । ‘ଭାରିଓ ବଟେ! ବାପରେ ବାପ ।’

ଖୁବ ଅନ୍ୟାଯ ହୟେ ଗେଛେ, ବୁନ୍ଦେ ପାରଲ ରାଫିଯାନ । ଆରେକବାର ଜିନାର ଗାଲ ଚେଟେ ନିତି ଗେଲ ।

ଏତ ବୈଶି ଶାନ୍ତ, ଏସବ ଭାଲ ଲାଗଇଁ ନା ଜିନାର । ଧାଇଁଢ଼ ଦିଯେ ସରିଯେ ଦିଲ ପୁଣ୍ୟଟାର ମୁଖ ।

‘ନୌକାଟା କଇ?’ ଉଠେ ବସେ ଦେଖାର ଶକ୍ତି ଓ ନେଇ ଯେନ ବବିନେର ।

ଗୋଙ୍ଗାତେ ଗୋଙ୍ଗାତେ ଉଠେ ବସିଲ କିଶୋର । ‘ଓଫକ୍,’ ବିକୃତ କରେ ଫେଲିଲ ମୁଖ, ‘୧୦୮୩ ପେଟେ । ବ୍ୟାଧାଆ! ଗେଲ କଇ ହତଚ୍ଛାଡ଼ା ନୌକା...ଓ, ଓଇ ଯେ, ଖାଲେର ଦିକେ ଯାଇଛ । ଆପାତତ ଜଲଘୋଟକୀ ଖୋଜା ବାଦ ।’

‘ଆମାଦେରେ ବାଦ ଦେଯା ଉଚିତ,’ ହାତେର ପେଶୀ ଟିପତେ ଟିପତେ ବଲିଲ ବବିନ । ‘ଯା ନାହା ହୟେଇଁ, କାଳଓ ବୈରୋତେ ପାରବ କିନା...ହେଇ ରାଫି, ସର! ଆମାର ଯାଇଁ କି ମଧୁ? ନା, ଚାଟିତେ ହବେ ନା ।’

‘চলো, আমরাও মিরে যাই,’ বলল কিশোর। ‘অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর তোকা থেজার সময় নেই।’

‘চলো,’ জিনা বলল। ‘দাঢ়াও আরেকটু জিরিয়ে নিই। আরি, আবার বসল দেখি পায়ের ওপর...এই রাফি, সর। লাখি মেরে ফেলে দেব কিন্তু পানিতে।’

কিন্তু লাখি আর মাঝতে হলো না। পানিতে পড়ার শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠে বসল জিনা। ভেলায় নেই রাফিয়ান।

পানিতে সাঁতার কাটছে। চোশমেজাজেই আছে।

‘কি আর করবে বেচারা?’ হেসে বলল মুসা। ‘সবাই খালি দূর দূর করছ। ভেলায় নেই জায়গা। বসবে কোথায় ও? মনের দৃঢ়ে তাই আত্মহত্যা করে জুলা জুড়োতে চাইছে।’

‘তুমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছ,’ রেঞ্জে উঠল জিনা।

‘হ্যা,’ মাথা দোলাল মুসা। ‘খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই আমার।’

‘তাহলে পড়ে কি করে?’

‘আমি কি জানি?’

‘দেখো, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না...’

‘তো কিভাবে...’

‘আহ, কি শুরু করলে?’ ধমক দিল কিশোর। ‘চুপ করো। রাফিকে টেনে তোলা দরকার। নিজে নিজে উঠতে পারবে না ও।’

টেনেহিচড়ে ভেলায় তোলা হলো রাফিয়ানকে। মুসাই সাহায্য করল বেশি। লজ্জিত হয়েছে জিনা। এখন আবার মুসার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে।

উঠেই জোরে গা ঝাড়া দিল রাফিয়ান। পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল সবার চোখমুখ। ‘এহহে,’ পরিষ্ঠিতি সহজ করার জন্যে হেসে উঠল রবিন, ‘ব্যাটা নিজেও ভিজেছে, আমাদেরও ভেজাচ্ছে।’

চুরুক্তে দেখতে আবার সহজ হয়ে এল ওরা। তখন এত বেশি ক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিল না কেউই।

খুব সুন্দর বিকেল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ধীরে ধীরে দাঢ় টানছে জিনা আর মুসা। হাদের কালচে মীল পানিতে ঢেউয়ের রিঙ তৈরি হচ্ছে, বড় হতে হতে ছাড়িয়ে গিয়ে ভাঙছে সোনালি বিলিক তুলে। ভেলার দুপাশেও সোনালি ফেনা। পাশে সাঁতার কাটছে দুটো জলমোরগ, বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঘোরাচ্ছে আর কিংক কিংক করছে, আসছে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে।

পানির কিনারে পাড়ের ওপর গড়িয়ে ওঠা বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে রবিনের নজর। সিন্দুর-লাল আকাশ। মাইলখানেক দূরের পাহাড়ী ঢালে বিশেষ একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।

উচু একটা পাথর।

সেটা র দিকে হাত তুলে বলল রবিন, ‘কিশোর, দেখো? ওই যে পাথরটা। সীমানার চিহ্ন? অনেক বড় কিন্তু।’

‘কই?’ কিশোর বলল। ‘ও, ওটা? কি জানি, বুঝতে পারছি না।’

‘অনেক লঘা...’ বলতে গেল মুসা।

কথাটা ধরে ফেলল কিশোর। কি যেন মনে পড়ে গেছে। ‘লঘা! টেল স্টোন! নকশায় লেখা রয়েছে না?’

‘হ্যাঁ, তাই তো,’ মাথা বাঁকাল মুসা। চেষ্টে আছে দূরের পাথরটার দিকে।

চার জোড়া চোখই এখন ওটার দিকে। ভেলা চলছে। আস্তে আস্তে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে পেল পাথরটা।

‘টেল স্টোন,’ আবার বিড়বিড় করল কিশোর। ‘ভুলেই পিয়েছিলাম।’

‘তোমার কি মনে হয়,’ জিনা বলল, ‘ওটার তলায়ই লুকানো আছে লুটের মাল?’

‘না,’ মাথা নাড়ল কিশোর। ‘ইয়তো একটা দিক-নির্দেশ...এই, জলনি বাও। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার, রাতের আগে।’

বারো

বোটাউসে চুকল ভেলা। খুঁটিতে আগের জায়গায় বাঁধা রয়েছে লিটল মারমেইড, ডারটি আব টিকসি নেই।

‘গেল কোথায়?’ টর্চ জুলে দেখছে কিশোর। ‘শোনো, ভেলাটা এখানে রাখা ঠিক না। চলো, কোন বোপের তলায় লুকিয়ে রাখি।’

ঠিকই বলেছে কিশোর। অন্যরাও একমত হলো। হাত অবশ হয়ে গেছে। তবু কোনমতে ভেলাটা আবার বের করে এনে পানির ওপর এসে পড়া কিছু ডালপাতার তলার শৈকড়ে শক্ত করে বাঁধল।

লতা আব শৈকড় ধরে ধরে পাড়ে উঠে রওনা হলো আনন্দানায়। চোখ চফল দুই ডাকাতকে খুঁজছে। ছায়াও দেখা যাচ্ছে না ওদের। পোড়া বাড়িতে ভাঙ্ডারে ঢুকে বসে নেই তো?

আগে রাফিয়ানকে ঢুকতে বলল ওরা।

সিডিমুখে মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান। শব্দ করল না। সিডি টপকে নেমে গেল নিচে।

নেমেই গৌ গৌ করে উঠল।

‘কি বাপার?’ বলল কিশোর। ‘বসে আছে নাকি নিচে?’

‘মনে হয় না,’ মাথা নাড়ল জিনা। ‘অন্য কিছু।’

‘কী?’

‘চলো না, নেমেই দেখি,’ সিডিতে পা বাখল জিনা।

বিছানা ফেডাবে করে রেখে পিয়েছিল, ঠিক তেমনি রয়েছে। ব্যাজ আব কাপড়-চোপড়ও রয়েছে জায়গামত। মোম জুলে টর্চ নিডিয়ে দিল কিশোর।

‘কি হয়েছে, রাফি?’ জিজেস করল জিনা। ‘এমন করছিস কেন?’

গোত্তনি ধামছে না রাফিয়ানের।

‘গান্ধ পেয়েছে নাকি?’ চারপাশে তাকিয়ে বলল মুসা। ‘ওরা এসেছিল এখানে?’

‘আসতেও পারে,’ রবিন কলল।

‘মরুকগে,’ হাত নাড়ল মুসা। ‘খিদে পেয়েছে। কিছু খেলে কেমন হয়?’

‘ভালই হয়, আমারও খিদে পেয়েছে,’ বলতে বলতে আলমারির দিকে এগোল কিশোর। কিন্তু টান দিয়ে দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেল।

নেই!

অথচ ওখানেই রেখে গিয়েছিল সব খাবার। থালা-বাসন, প্লেট-কাণ, সব সাজানোই রয়েছে আগের মত, নেই শুধু খাবারগুলো। কুটি নেই, বিস্কুট নেই, চকলেট নেই...কিছু নেই।

কিশোরের ভাব দেখেই বুঝল অনোরা, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এগোল আলমারির দিকে।

‘ঋহিছে!’ আঁতকে উঠল মুসা। ‘কিছুই তো নেই। একটা বিস্কুটও না। ইস আগেই ভাবা উচিত ছিল। আঞ্চলিক, কি খেয়ে বাঁচি এখন!!’

‘শুর চালাকি করেছে,’ রবিন কলল। ‘জানে, খাবার ছাড়া থাকতে পারব না এখানে। আমাদের তাড়ানোর এটাই সবচেয়ে ভাল কৌশল। রাতে খিদেয় মরব, সকালে উঠেই দোভাতে হবে গীরে, অনেক সময় পাবে ওরা।’

মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে আলমারির কাছেই বসে পড়ল মুসা। ‘গীয়ে যাওয়ারও সময় নেই এখন। যা পথ-ঘাট, অঙ্কফার! উফ, খিদেও পেয়েছে। নাহ রাতটা টিকব না।’

মন খারাপ হয়ে গেছে সবার। কতক্ষণ আর খিদে সওয়া যায়? ক্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, ভেবেছিল খেয়েদেয়ে চাঙা হবে, তার আর উপায় নেই।

বিছানায় বসে দীর্ঘশাস ফেলল রবিন। ‘একবার ভেবে ছিলাম, কয়েকটা চকলেট সরিয়ে রেখে যাই, রাখলাম না...রাফি, ওভাবে আলমারির দিকে চেয়ে লাভ নেই। কিছু নেই ওতে।’

আলমারি উঠকছে, আর কর্ণ চোখে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে রাফিয়ান।

‘হারামীগুলো কোথায়?’ হঠাৎ রেগে গেল কিশোর। ‘ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। বুঁকিয়ে দেয়া দরকার লোকের খাবার চুরি করার ফল।’

‘হফ,’ পুরোপুরি একমত হলো রাফিয়ান।

সিডি বেয়ে ওপরে উঠল কিশোর। দুই ডাঢ়াক কোথায়? ভাঙ্গা, শূন্য দরজার কাছে গিয়ে দূরে তাকাল।

বনের মাঝে এক জায়গায় দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাহলে ওখানেই শুমানোর ব্যাবস্থা করেছে, ভাবল সে। চোরগুলোকে গিয়ে গালাগাল করে আসবে নাকি? হ্যাঁ, তাই যাবে।

‘আয়, রাফি,’ বলে পা খাড়াল কিশোর।

কিন্তু তাঁবুতে কেউ নেই। কয়েকটা কম্বল, একটা প্রাইমাস স্টোভ, একটা কেটলি আর অন্যান্য কিছু দরকারী জিনিস অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। একটা তাঁবুর কোণে গান্দি করে রাখা আছে কি যেন, কাণ্ড দিয়ে ঢাকা।

টিকসি আর ডার্বিটি গেল কোথায়?

বুজতে বেরোল কিশোর।

পাত্রয়া গেল হন্দের ধারে গাছের তলায়, পায়চারি করছে। কথা বলছে। বাই, সান্ধা-অমল, মুখ বাঁকাল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচের ঠোটে চিমটি কাটছে, ভাবছে কিছু। যে কাজে এসেছিল, সেটা না করে ফিরে চলল আজ্ঞানায়।

পেছনে রাফিয়ান, বাতাসে কি যেন উক্ততে উক্ততে চলেছে।

'তাবু খাটিয়েছে,' বন্ধুদের জানাল কিশোর। 'বাটিরা রয়েছে লেকের পাড়ে। জুটের মাল না নিয়ে যাবে না।'

'আরে রাফি কোথায়?' সিডিমুখের দিকে চেয়ে আছে জিনা। 'কিশোর, কোথায় ফেলে এল ওকে?'

'পেছনেই তো আসছিল...দেখি তো,' সিডির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর। ওপরে মেঝেতে পরিচিত নথের শব্দ।

বিড়ি বেরে নেমে এল রাফিয়ান।

'আরে, দেরো, মুখে করে কি জানি নিয়ে এসেছে।' বলে উঠল জিনা।

তার কোলের কাছে এনে জিনিসটা বাখল রাফিয়ান।

'বিস্তুটির টিন।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পেল কই?'

নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল কিশোর। বলল, 'আমি যা করব ভাবছিলাম, রাফিই এসেছি করে ফেলল। তাবুতে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে খাবার, অনেক খাবার। ফিরে এসেছি, সবাই মিলে গিয়ে জুট করে আনার জন্যে, আর দরকার হবে না।'

আবার সিডি দিয়ে উঠে যাচ্ছে রাফিয়ান।

'ওরা যেখন করমাচা, আমরা তেমনি বাধা তেহুল,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'কারও চেয়ে কেউ কম নই।...রাফিটা আবার গেল?'

'যাক,' বলল জিনা।

এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রাফি। মুখে বাদামী কাণ্ডে মোড়া মন্ত এক পাকেট।

বিশাল কেক।

হেসে গড়গড়ি খেতে শুরু করল গোয়েন্দারা।

'রাফি, তুই একটা বাঘের বাচ্চা,' হাসি থামাতে পারছে না মুসা।

'আরে না, সিংহের,' শুধরে দিল জিনা।

'আমার তো মনে হয় ওর বৃপ্ত বাবুর্চি ছিল,' পেট চেপে ধরেছে রবিন, চোখের কাণে পানি। 'বেছে বেছে পছন্দসই খাবারগুলো আনছে।'

আবার চলে গেছে রাফিয়ান। ফিরে এল শক্ত মলাটের একটা বাক্স নিয়ে। পক্ষে মাসের বড়।

'চাক্কর করে দিল দেখি।' বলল মুসা। 'কোথায় পেটে পাথর বাধার কথা ভাবছিলাম, আর হাজির হয়ে গেল একেবারে রাজকীয় ভোগ...'

'দাক্কণ হয়েছে,' মাথা বাঁকাল কিশোর। 'আমাদেরগুলো বাটিরা নিয়েছে, আমরা ওদেরগুলো নিয়ে এসেছি। রাফি, আবার যা!'

কিশোরের বলার আগেই রওনা দিয়েছে রাফিয়ান।

কি আনে, দেখাব জন্যে উৎসুক হয়ে রইল চারজন।

নিয়ে এল বাবেক বাবু মাসের কাবাব।

‘তুই একটা সাংঘাতিক লোক, রাফি! উচ্ছিত প্রশংসা করল মুসা, ‘বুব ভাল মানুষ। এত সুগন্ধ, তা-ও ছুরেও দেখছিস না। আমি হলে তো চারার লোভ সামলাতে পারতাম না।’

বাবার চুরি কুবার নেশায় পেয়েছে রাফিয়ানকে। যাচ্ছে-আসছে, যাচ্ছে-আসছে, প্রতিবারেই মুখে করে নিয়ে আসছে একটা কিছু।

‘এবাব ওকে খামানো দরকার,’ বলল কিশোর। ‘যথেষ্ট হয়েছে। যা নিয়েছিল বাটোৱা, তাৰ তিনজুণ এসেছে।’

‘থাক, শুধু আবেকবাব,’ হাত তুলল জিনা। ‘দেখি, এবাব কি আনে।’

টেনে-হিচড়ে ইয়া বড় এক বদ্ধা নিয়ে হাজিব হলো রাফিয়ান।

আবাব হাসাহাসি শুরু হলো। না ঠেকালে সব নিয়ে আসবে। কিষু বাখবে না, শূন্য করে দিয়ে আসবে।

‘রাফি,’ বেচ্টি টেনে ধরল জিনা, ‘আৰ না। দয়ে পড়, জিরিয়ে নে। বাঁচালি আমাদেৱ।’

প্রশংসায় খুব খুশি হলো রাফিয়ান। জিনার গালটা একবাব চেটে দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তাৰ পায়েৱ কাছে। জিন বেৱে করে হাঁপাচ্ছে।

বন্ধুটা খুলল মুসা। ঘৰে বানানো পাউকফটি আৰ বনকফটি। ‘হৱৱে...’ আনন্দে নাচতো শুরু কৰল সে। ‘রাফি, তো পায়ে হাত দিয়ে সালাম কৰতে ইচ্ছে কৰছে।’

কি বুবাল কুকুরটা কে জানে, একটা পা বাড়িয়ে দিল।

‘নাও, কৰো এবাব,’ হা-হা কৰে হেসে উঠল কিশোর। সবাই যোগ দিল হাসিতে।

পেট পুৱে খেলো ওৱা। রাফিয়ানেৱ পেট ফুলে দোল, মড়তে পাৱছে না ঠিকমত। হাসাকৰ ভঙ্গিতে পেটটাকে দোলাতে দোলাতে উঠে গেল সিডি বেয়ে, পানি থাওয়াৰ জন্যো। কল ছেড়ে দিল জিনা। সামনেৱ দুই পা সিংকে তুলে দিয়ে পানি খেলো রাফিয়ান।

সিংক থেকে থাবা নামিয়েই শিৰ হয়ে গেল সে। ঘুৱে বনেৱ দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ কৰে উঠল।

ছুটে এল সবাই। কোপকোড়েৱ ওপৰ দিয়ে ভাৱটিৰ মাথা দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে।

কাছে এসে ঢেঁচিয়ে উঠল সে, ‘আমাদেৱ খাবাৰ চুৱি কৰেছ?’

‘কে বলল?’ ঢেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর, ‘আমাদেৱ খাবাৰই আমৰা কিৰিয়ে এনেছি।’

‘এতবড় সাইস, আমাৰ তাৰুতে হানা...’ রাগে বাকৰক হয়ে গেল ভাৱটিৰ। ঝৌকড়া চুল নাড়ল, সৌবেৱ আবছা আলোয় অঙ্কুত দেখাচ্ছে তাৰ চেহাৰা, চুলৱ জন্যো।

‘না আমৰা যাইনি,’ সহজ কৰ্ত্ত বলল কিশোর, ‘রাফি পিয়েছিল। আমৰা বৰং

ঠেকিয়েছি, নইলে রাতে তোমাদের খাওয়া জুটত না। আমাদের তো উপোস
বাখতে চেয়েছিল, আমরা তোমাদের মত অত ছেটিলোক নই...না, না, আর কাছে
এসো না, রাফি বেগে যাবে। আর হ্যাঁ, সারা রাত পাহারায় থাকবে ও। গায়ে ওর
সিংহের জোর, মনে রেখো।'

'গরবরু,' এত জোরে গর্জন করল রাফিয়ান, লাক্ষণ্যে উঠল ভারতি। তার মনে
হলো সিংহেরই গর্জন।

ভীম ঝাপে হাত নেড়ে বাটিকা দিয়ে ঘুরল সে। চলে গেল।

সিডিমুরে রাফিয়ানকে মোতায়েন করে ভাঙারে ফিরল চারজন।

'ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই,' চিন্তিত ভঙিতে বলল কিশোর।

'নিচয় পিস্তল-টিস্তল কিছু আলেনি, নইলে এতক্ষণে ওলি করে মারত রাফিকে।'

'তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের,' বলল রবিন। 'মালঙ্গলো খুঁজে বের করে
নিয়ে পালানো দরকার। ঠিকই বলেছ, ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। কখন যে কি
করে আছো, নকশা নিয়ে বসলে কেমন হয়? টিল স্টেন তো দেখেছি।'

নকশা বের করে সমাধান করতে বসল ডোঁ।

'এই যে,' একটা রেখার মাথায় আঙুল রাখল কিশোর। 'তাহলে, এটা উল্টো
দিকে টক হিল, এই যে,' আরেক মাথায় আঙুল রাখল।

'তুমি ভাবতে থাকো,' চিত হয়ে ওয়ে পড়ল মুসা। 'আমি একটু গড়িয়ে নিই।
গত খাটানোর দরকার পড়লে ডেকো।'

মোমের আলোয় গভীর মনোযোগে নকশাটা দেখছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি
কাটিছে নিচের ঠোঁটে। বিড়বিড় করল, 'চারটে...টিল স্টেন...টক হিল...চিমনি...
স্টোপল।' হঠাত ঠেচিয়ে উঠল, 'ইউবেকা! ইউবেকা!'

লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। 'আমেরিকা আবিস্তার করলে নাকি?'

'না, লুটের মাল।'

'কোথায়?' ঘরের চারদিকে ডাকাল গোয়েন্দা-সহকারী। চোখে বিশ্বাস।

'আরে ওখানে না, এখানে,' নকশাটায় হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বুঁৰো
গেছি।'

তেরো

'এক এক করে ধৰা যাক,' উৎক্ষেপনায় মনু কাপছে কিশোরের গলা। 'চু-চুজ।' এই
যে, এখানে দ্রাক শয়তার। যেখানে লুটের মাল লুকানো রয়েছে। ওয়াটাৰ মেয়াৰ।
সাৰ মাদ্বা লুকানো রয়েছে। হদের পানিতে কোথাও লকিয়ে রেখেছে নৌকাটা।'

'বলে যাও,' জিনা আর রবিনকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে বসল মুসা।

'চিকসি হয়তো জেরির পুরানো বান্ধবী,' বলল কিশোর, 'তাহলে জেরির
কাজকর্মের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। নকশার মানে বুঁৰো ফেলেছে। বুঁৰোছে,
কোথায় লুকানো রয়েছে নৌকাটা।'

কাগজের এক জায়গায় তজলী দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'এখন দেখি, আমরা কি
বুঁৰোছ, টিল স্টেন তো দেখেছি আমরা, নাকি? বেশ। লেকের এমন কোন জায়গা

আছে, যেখান থেকে শুধু টিম স্টোন নয়, টক হিল, চিমনি, স্টীপলও দেখা যাবে। চারটে জিনিসই এক জায়গা থেকে দেখা যাবে। এবং ওই জায়গায়ই লুকানো রায়েছে লুটের মাল।'

অন্য তিনজন নীরব।

'আমি একটা গাধা,' সরল মনে শীর্কার করল মুসা। 'এই সহজ বাপাবটা বুকালাম না। লুটের মাল রায়েছে, তারমানে ওয়াটার মেয়ারকেও ওখানেই পাওয়া যাবে, গিয়ে খালি তুলে নেয়া।'

'হ্যা,' বলল কিশোর। 'তবে ভারটি আর টিকসির কথা ভুলো না। আমাদের আগে ওরা ও গিয়ে হাজির হতে পারে, তুলে নিতে পারে জিনিসগুলো। কেড়ে নিতে পারব না, আমরা পুলিশ নই। নিয়ে সোজা চলে যাবে, কখতেও পারব না।'

সবাই উত্তেজিত।

'তাহলে তো কাল ডোরেই যাওয়া উচিত,' বলল রবিন। 'আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ব। ভারটি আর টিকসির আগেই গিয়ে তুলে নেব। ইস, একটা আলাম-রুক থাকলে ভাল হত।'

'ভেলায় করে চলে যাব,' মুসা বলল। 'বাকি তিনটে চিঙ ধুঁজে বের করে...'

'তিনটো নয়, দুটো,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'চিমনিটা ট্ৰাণজেছ রয়েছে। দেয়াল করোনি, এ-বাড়িটার বাবে উচু একটা চিমনি?'

'আমি করেছি,' রবিন বলল।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শ আর আলোচনার পর ঠিক হলো, ডোরে উঠেই বেরোবে। সাত বেশি না করে তয়ে পড়ল ওরা, নইলে সকাল সকাল উঠতে পারবে না।

সিডিমুখের কাছে ঘয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কান সজাপ।

সারাদিন 'অনেক পরিশম' করেছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেরা।

কেউ বিহুত করল না সে-বাতে। খাবারের গন্ধে লোক সামলাতে না পেরে চুপি চুপি এসে উঁকি দিল একবার সেই শেঘালটা। নড়লও না রাফিয়ান, চোখও মেলল না, চাপা গলায় গুরুণ করল শুধু একবার। তাতেই যা বোন্ধাৰ বুৰো নিয়ে ফোলা লেজ আরও ফুলিয়ে পালাল শেঘাল মহাশয়। কৰ্তৃ চিন্কোৱ করে উঠল একটা হতুম পেঁচা। ওটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কা-কা করল একটা দাঁড়কাক, ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

হামাগড়ি দিয়ে এল যেন আবছা আলো, বনের কালো অঙ্ককালকে কঠিন হাতে তাড়ানোৰ সাহস নেই বুঝি। উঠে গা বাঢ়া দিয়ে ভাঙ্গা দৱঁজাৰ কাতে এগোল রাফিয়ান। তাবু দৃঢ়টা দেখল, চোখে পড়ল না কাউকে। ফিরে এসে সিডি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল ভাঙ্গাৰে।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে পেল মুসা আৱ কিশোৱ।

'কটা বাজে?' ঘাড়ি দেখেই চমকে উঠে বসল কিশোৱ। 'সাড়ে সাতটা।'

'খাইছে!' আতকে উঠল মুসা। 'এই ওঠো ওঠো। দুপুৰ হয়ে গেছে।'

মুক্ত হাত মুখ খুয়ে, দাঁত মেজে, চুল আঁচড়ে নিল ওরা। পৰানেৰ কাপড় বোড়ে নিল হাত দিয়ে। তাঙ্গাতাঙ্গি খাবাৰ কেড়ে দিল রবিন আৱ জিনা। নাকেমুখে

কোনমতে খাবারগুলো উঁজে দিয়ে সিঁটকের বল থেকে পানি খেলো।

বেরোনোর জন্মে তৈরি।

‘তাবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

‘ওড়,’ বলল কিশোর। ‘যুম থেকে ওটেনি। আমরাই আগে যাচ্ছি।’

ভেলায় চড়ে বসল অভিযানীরা। দাঢ় তুলে নিল হাতে। সবাই উশেজিত, গাফিয়ানও।

‘আগে টিল স্টোনটা বের করি,’ বল্পাত করে পানিতে দাঢ় ফেলল কিশোর।

‘হদের মাবাখানে চলে এল ওরা। টিল স্টোন চোখে পড়ছে না। চেয়ে চেয়ে চোখ বাধা করে ফেলল। গেল কোথায় উচু পাথরটা?’

সবার আগে দেখল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, ‘এই যে, এইই, উচু গাহগুলোর পরে...’

‘টিল স্টোন তো পাওয়া গেল,’ বলল কিশোর। ‘এই, ত্রোমরা উল্লেদিকে চাও হো, তিক হিল দেখা যায় কিনা? কোন পাহাড়-চাহাড়? আমি টিল স্টোনের ওপর চোখ দ্বা খুলাম। দরকার হলে ভেলটা সামনে পেছনে কোরো।’

তিক হিলও মুসাই আগে দেখল। ‘পেয়েছি।’ বলল সে। ‘ওটাই, দেখো দেখো, অস্তুত একটা পাহাড়, পিরামিডের মত চূড়া...কিশোর, টিল স্টোন এখনও দেখা যাচ্ছে?’

‘হ্যা,’ বলল কিশোর। ‘তুমি পাহাড়টা থেকে চোখ সরিও না। জিনা, দেখো এই স্টোপলু দেখা যাব কিনা?’ টিল স্টোনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্মে চোখ সরাচ্ছে না সে। ‘দেখো, পুরানো বাড়ি, পির্জা, মন্দিরের চূড়া বা কুন্ড...’

‘দেখেছি, দেখেছি! এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিনা, যা, যার চিহ্ন থেকে চোখ সারণ্যে ফেলল মুসা আর কিশোর। রবিন আগেই সরিয়েছে।

স্থানের বোদে বালমু করছে পির্জাৰ পাথৰে তৈরি চূড়া।

‘চমৎকার,’ বলল কিশোর। ‘রবিন, দেখো তো, চিমনিটা দেখা যাব?’

‘না,’ রবিন বলল। ‘মুসা আরেকটু দায়ে সরাও...আরেকটু...হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। আব না, আব না...’

দাঢ় বাওয়া বক্ষ কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকল না ভেলা, আপনগতিতে অল্প ধূত করে সরে গেল। পানিতে বার দুই দাঢ়ের বেঁচা মেরে আবার সরাতে হলো ভেলটা। ইতিমধ্যে পির্জা হারিয়ে ফেলেছে জিনা।

পুকুটি ওদিক, একটু ওদিক করে করে আবার জায়গামত আনা হলো ভেলা, ধানার চারটো চিঙ্গ চোখে পড়ল।

‘কিন্তু একটা মারকার ফেলে জায়গাটোর চিঙ্গ রাখা দরকার,’ টিল স্টোন থেকে চোখ সরাল না কিশোর। ‘জিনা, দেখো তো, চূড়া আব পাথৰের ওপর একসঙ্গে চোখ রাখতে পারো নাকি?’

‘নৌৰ চেষ্টা করে,’ চূড়া থেকে চোখ সরিয়ে চট করে পাথৰটাৰ দিকে তাকাল জিনা, নামপর আবার চূড়াৰ দিকে। কাঞ্জটা সহজ নয়। ভেলা খালি নড়ছে, স্থির রাখা যাবে না পুরোপুরি, যাবে বলেও মনে হয় না।

মুগ্ধ হাত চালাল কিশোর। একটা টুচ আব পকেট-জুরি বের কৰল। ‘জিনা,

তোমার ব্যাগে ফিতা আছে?

'দেখো, আছে কয়েকটা,' দুটো চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম থাক্কে জিনা।

একটার সঙ্গে আরেকটা ফিতের মাথা বেঁধে জোড়া দিয়ে লম্বা করল কিশোর। ছুরি আর টর্চ এক করে ফিতের একমাথা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর ফিতে ধরে ছেড়ে দিল পানিতে, আন্তে আন্তে ছাড়তে লাগল। ঢান থেমে গেল এক সময়, বোকা গেল হন্দের তলায় পৌছেছে ভাব।

এক হাতে ফিতে ধরে তরুে আরেক হাতে পকেট খুজল কিশোর। এক অলস মুহূর্তে একটা কর্ককে ছুরি দিয়ে কেটে চেঁচে একটা ঘোড়ার মাথা বানিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওটা। বের করল পকেট ধোকে। ফিতেটাকে ঢান ঢান করে এমন এক জায়গায় কর্ক বাঁধল, যেন ওটা পানির সমতলের ঠিক নিচে ভাসে।

ভেসে রইল কক্ষটা, দোড়ের নড়াচড়ায় আলতো চেউ উঠছে, তাতে লুকোচুরি ফেলতে থাকল ঘোড়ার মাথা।

'হয়েছে,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'চিহ্ন থেকে চোখ সরাতে পারো।'

ঘোড়ার মাথাটার দিকে তাকাল মুসা। 'এত আগাম চিন্তা করো কিভাবে?': বন্ধুর বুকির তারিফ করল সে। 'কিন্তু জিনিসটা বেশি ছেট। আবার খুজে বের করতে পারব? বড় কিছু হলে ভাল হত না?'

'সেটাই ভাবছি,' বলল কিশোর। 'কিন্তু বড় আর কি আছে?'

'আমার মেকআপ বক্সটা ধার নিতে পারো,' জিনা বলল। 'না ও,' হাত বাড়াল কিশোর।

ব্যাগ খুলে বেশ বড় একটা প্লাস্টিকের বাল্প বের করল জিনা। বুর শক্ত হয়ে লাগে ডালা, ভেতরে পানি তো ঢুকবেই না, বাতাসও ঢোকে না তেমন, বায়ুনিরোধকই বলা চলে। ভেসে থাকবে। এক এক করে লিপস্টিক, পাইলাইসের কোটা, চিরুনি আর ট্যুবিটাকি অন্যান্য জিনিস ব্যাগে রেখে বাক্সটা দিল সে।

'মেয়েদের অকাজের বাল্পও অনেক সময় কাজে লাগে,' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

ঢান দিয়ে বাক্সটা সরিয়ে আনল জিনা। 'দেখো, ভাল হবে না। আমাকে রাখালে বাল্প দেব না আমি।'

'না না, না ও, এমনি ছাপ্টা করলাম,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

কুরুক্ষের পরে 'বাল্প' যে ফিতেটুকু রয়েছে, সেটা দিয়ে বাল্প বেঁধে পানিতে ছাড়ল কিশোর। ভেসে রই। বোকা থাক্কে, থাকবে।

'ফাইন,' বলল কিশোর। 'এবার দূর থেকেও চোখে পড়বে। দেখি তো, তলায় কি আছে?'

ভেলার ধার দিয়ে দুকে চারজনেই নিচে তাকাল। কিছুই না বুঝে রাফিয়ানও গলা খাড়িয়ে দিল পানির দিকে।

অন্তর্ভুক্ত এক দৃশ্য। হন্দের তলায় বড় কালো একটা ছায়া। ছোট ছোট ঢেউয়ের জন্যে অক্ষিষ্ঠ লাগছে, কেমন কাপা কাপা, তবে নৌকা যে তাতে কোন সন্দেহ

নেই।

‘ওয়াটার মেয়ার,’ বিড়বিড় করল মুসা।

‘জেরি ব্যাটো খুব চালাক,’ কিশোর বলল। ‘লুটের মাল লুকানোর কি একথান
জাহাগা খুজে বের করেছে। নৌকার তলা ফুটো করে ঢুবিয়েছে নিশ্চয়।’

‘কিন্তু নৌকাটা তুলব কি করে?’

‘তাই তো ভাবছি,’ ঘেমে গেল কিশোর। ঘেউ ঘেউ করেছে রাফিয়ান।

একটা নৌকা ছুটে আসছে এদিকে, লিটল মারমেইড। টিকিসি আৰু ডারটি
দুজনেই দাঢ় বাইছে। কেলার দিকে বেয়াল নেই, হৃদের চারপাশের তীব্রের দিকে
ঠোখ, একবার এদিক চাইছে, একবার ওদিক। বোধা গেল, চিহ্নগুলো খুজছে ওৱা।

‘তৈতি হয়ে যাও, সবাই,’ আস্তে বলল কিশোর। ‘আজ আমাদের বাধা না-ও
মানতে পারে।’

চোদন

গাছে এগিয়ে আসছে নৌকা। দাঢ় তুলে নিয়েছে টিকিসি, দুই-তিনটা চিহ্নের ওপর
একা ঠোখ রাখতে হচ্ছে তাকে। বালি মাথা ঘোরাচ্ছে অপাশ-ওপাশ।

ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে রাফিয়ান।

তার মাথায় হাত রেখে শাস্তি হতে বলল জিনা।

দুই ডাকাতের অবস্থা দেখে হাসি পেল অভিযাত্তীদের। তো চারজন চারটে
চিহ্নের ওপর ঠোখ রাখতে হিমশিম খাল্লি, আৰু দুজনের কতখানি অসুবিধে হবে সে
খে কোথাই যায়।

নির্দেশ দিলে টিকিসি, ‘এদিকে আরেকটু বাঁয়ো... এহচে, বেশি হয়ে গেল...
মানে ডান-ডানে...’

কিছু বলল ডারটি।

গাট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল টিকিসি। জেলাটা দেখে রাগে তুলে উঠল।
প্রক্ষেপণ আবাব ফিল্ড চিহ্নগুলোর দিকে। নিচু গলায় বলল কিছু ডারটিকে। মাথা
মাঝাল-ডারটি ভাঙ্গ হয়ে উঠেছে দুজনেরই চেহারা।

গাট বাঢ়তে নৌকার, দোঙা এগিয়ে আসছে।

‘ধারে, ধাকা মারো! ’ বলে উঠল রবিন।

ধাকা দেয়ে দূলে উঠল তেলা, আরেকটু হলেই পানিতে উল্টে পড়ে যাল্লিল
গান। শুশ করে তাঁর হাত চেপে ধরল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, ‘এই চোখের মাথা
খোচ। শয়তান কোথাও আৰ। তেবেছ কি?’

‘তোরা কেন এসেছি এখানে?’ গার্জে উঠল ডারটি।

‘বেগে গেল রাফিয়ান, দাঁতমুখ খিচিয়ে চেঁচাতে লক্ষ কৰল।

‘কোর বাপ্পের জাহাগা...’ দাঢ়টা তুলে নিল মুসা, ঝাগে কথা সরচে না।

কামে হাত দিয়ে তাকে চুপ কৰতে বলল কিশোর। ডারটিকে ফিরল,
মাধ্যানের ভয়ে দীরে দীরে নৌকা পিছিয়ে নিলেছে ডাকাতটা।

‘মখো,’ শাস্তি কষ্টে বলল গোয়েলাপ্রধান, ‘তোমরা বেশি বাড়াবাঢ়ি কৰছ।

হলে অনেক জায়গা, আমাদের কাছে তোমাদের না এলেও চলে। খামোকা এসব
করছ কেন?

‘পুলিশের কাছে যাওছি,’ বাগে লাল হয়ে গেছে টিকিসির মুখ, ‘তোমরাও
বাড়াবাড়ি কম করছ না। না বলে অনেকের ভেলা নিয়ে এসেছ, অনেক বাড়িতে জোর
করে ঘূমাছে, আমাদের খাবার চুরি করেছ…’

‘আবার সেই এক কথা,’ হতাশ ভঙ্গিতে দুঃস্থাত নাড়ল কিশোর। ‘তোমরা কি
করেছ? নৌকা বলে এনেছ? আমরা খাবার চুরি করেছি না তোমরা আমাদের খাবার
চুরি করেছ? একটু আগে কি করলে? খাঙ্গা মেরে ভেলা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।
যাও না পুলিশের কাছে, বলো গিয়ে। আমাদেরও মুখ আছে।’

ফুসকে ডারটি। নাড়ল তুলে নিল, ছুঁড়ে মাঝেবে।

‘ধৰবদার,’ আশুল তুলল কিশোর। ‘অনেক সহা করেছি আর না। এবার কুকুর
লেলিয়ে দেব। তোমাকে ছেড়ার জন্মে অস্তির হয়ে আছে রাফি।’

‘গরুরুর! কিশোরের কথায় সায় দিয়ে একসারি ‘চমৎকার’ নাড় ডারটিকে
দেখিয়ে নিল রাফিয়ান।

ছিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত। নিচু গলায় কিছু আলোচনা করল। তারপর মুখ
ফিরিয়ে গলার স্বর নরম করে টিকিসি বলল, ‘দেখো ছেলেবা, আমরা শাস্তিতে ছুটি
কাটাতে এনেছি, উইক-এভে। কিন্তু আমরা যেখানেই যাই দেখি তোমরা আছ, এটা
আমাদের ডাল লাগে না। আসলে, আশেপাশে কেউ না খাকুক এটাই চাইছি
আমরা। ঠিক আছে, একটা রফা করা যাক। তোমরা চলে যাও, আমরা তাহলে
পুলিশকে কিছু বলব না। খাবার যে চুরি করেছ, একথা ও না।’

‘পুলিশের কাছে যেতে কে মানা করছে? যাও না,’ বলল কিশোর। ‘রফাটিকা
কিছু হবে না। আমাদের যখনে বুশি তখন যাব।’

জুলে উঠল টিকিসির চোখ। সামলে নিল, আবার আলোচনা করল ডারটির
সঙ্গে। ফিরে জিজেস করল, ‘ছুটি কদিন তোমাদের? কবে যাচ্ছ?’

‘আগামীকাল,’ বলল কিশোর।

আবার কিছু আ... চল। রেল দুজনে

আস্তে করে নৌকাটা করে সরিয়ে নিল ডারটি। উকি দিয়ে পানির নিচে
তাকাল টিকিসি। মুখ তুলে ডারটির দিকে ফিরে মাথা ঘোরান।

ছেলেদের সঙ্গে আব একটাও কথা না বলে নৌকা নিয়ে চলে গোল ঘো।

‘কি করবে বুবোছি,’ হাসিমুরে বলল কিশোর। ‘কাল আমাদের চলে যাওয়ার
অপেক্ষায় থাকবে। তারপর আসবে নিরাপদে লুটের মাল তুলে নেয়ার জন্মে।
টিকিসি পানির দিকে তাকিয়েছিল, খেয়াল করেছ? নৌকাটা দেখেছে। আমাদের
মাকারও দেখেছে।’

‘তাহলে এত বুশি হয়েছ কেন?’ জিনা বুবাতে পারছে না। ‘নৌকাটা আমরা
তুল্টি পারছি না। আব আগামীকাল চলে যেতেই হচ্ছে। শুল মিল করা চলবে
না।’

দূরে চলে গেছে নৌকা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, ‘কাল যে-যাব, এটা
ইচ্ছে করেছি বলেছি, ওদের সরানোর জন্মে। লুটের মাল তুলে নিতে পারব

আমরা।

'কিভাবে?' একসঙ্গে বলল অন্য তিনজন। রাফিকানও মুখ বাড়াল সামনে, যেন
সে-ও জানতে চায়।

'মৌকা তো চাই না আমরা,' কিশোর বলল, 'চাই মালত্তলো। তাহলে
নৌকাটা তোলার দরকার কি? ডুব দিয়ে শিয়ে ওগলো তুলে নিয়ে এলেই হলো।
মনে হয় কোন বস্তা বা বাক্সের মধ্যে রেখেছে। ভাবি না হলে এমনিতেই তোলা
যাবে, আর ভাবি হলে দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে হবে।'

'তবলতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু যাচ্ছে কে?' ছদের কালো পানির দিকে চেয়ে
বলল রবিন। 'আমার ভাই ভয় লাগে।'

'আমি যাব,' মুসা বলল। 'সেদিন থেকেই তো খালি ভেলায় করে ঘুরছি।
একবারও বাতার কাটিতে পারিনি। রখ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।'

'ভালমত ভেবে দেখো,' কিশোর সাবধান করল। 'যা ঠাণ্ডা, শেষে না
নিউমোনিয়া বাধাও।'

'আরে দূর,' পাঞ্চাই দিল না মুসা। 'পানিতে বরফ ওলে দিলেও ঠাণ্ডা লাগবে
না আমার।'

বিশ্বাস করল সবাই। এই ছদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকলেও নিজু হবে না
তার।

তিন-চার ঢানে জামাকাপড় সব খুলে ফেলল মুসা। খালি হাফপ্যান্টটা রাখল
পরনে। এতই নির্বৃত ভাবে ডাইভ দিয়ে নেমে গেল, ঢেউ প্রায় উঠলই না। বকের
মত গলা বাড়িয়ে ভেলার কিনারে ঝুকে এল অন্য তিনজন। দেখছে, হাত-পা নেড়ে
নেমে যাচ্ছে একটা আবছা মৃতি। কালো পানিতে কেমন যেন ভৃতুড়ে দেখাচ্ছে।

সময় কাটছে।

'একঙ্গল থাকে কি করে?' উঠিয়া হলো রবিন। 'বিপদ-টিপদ...'

'না,' বলল কিশোর। 'ওকে তো চেনই। অনেকক্ষণ দম রাখতে পারে। সেই
গে সেবার...'

হস্স করে ভেলার পাশে ভেসে উঠল মুসার মাথা। জোরে জোরে কয়েকবার
শ্বাস টেনে বলল, 'আছে!'

'কি কি দেখলে?' জিজেস করল কিশোর।

ভেলার কিনার খামচে ধরে ভেসে রইল মুসা। দম নিয়ে বলল, 'এক ডুবে
গোজা গিয়ে নামলাম নৌকায়। ভাঙ্গা, পুরানো। তুলতে গেলে খুলে যাবে জোড়ায়,
পচে গেছে। পলিথিনের একটা বাগে রয়েছে মালত্তলো। বেজায় ভাবি। টানাটানি
করেছি, তুলতে পারলাম না।'

'নড়েছে?' জিজেস করল কিশোর।

'না, নড়েওনি।'

'তাহলে বেঁধে রেখেছে হয়তো। কিন্বা অন্য কোনভাবে আটকে রেখেছে।
বেঁধে দিয়ে আসতে হবে। তারপর সবাই মিলে টেনে তুলব। তবে তার আগে
কিম্ব অটিকালো রয়েছে, সেটাও খুলে দিয়ে আসতে হবে।'

পানিতে বিচির শিরশিরানি তুলে বায়ে গেল একঙ্গল বাতাস। সামান্য কাঁটা

দিয়ে উঠল মুসার গা।

‘বাহ, ব্যায়ামবীরেরও কাপুনি উঠে দেখি,’ হেসে বলল জিনা। ‘বুকলাম, তলায় কেমন ঠাণ্ডা। আমিও নামব ভাবছিলাম।’

‘তাহলে এসো।’

‘কাপড় আনিনি তো... ওঠো। গা মোছো।’

‘দাঢ়াও, খানিকক্ষণ সাতার কেটে নিই।’

‘না না, উঠে পড়ো,’ বাধা দিল কিশোর। ‘পরে আবও তোবাঙ্গুবি করতে হবে। বোটহাউস থেকে গিয়ে দড়ি আনতে হবে আগে।’ তীরের দিকে তাকাল সে।

নৌকা তীরের কাছে একটা শেকড়ে বেঁধে ওপরে উঠে গেছে দুই ডাকাত। দেখা যাচ্ছে না ওদেরকে। হঠাত আলোর খিলিক দেখতে পেল কিশোর, রোদে লেগে বিক করে উঠেছে কিছু।

আরেকবার দেখা গেল খিলিক। রবিনও দেখল এবার। ‘কি ব্যাপার?’ সপ্তপ্রাচী কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

‘বুকাতে পারছ না? দূরবীণ। ব্যাটারা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ রেখেছে আমাদের ওপর। মুসা যে ডুব দিয়ে এসেছে, তা-ও দেখেছে।’

‘তাহলে?’ জিনার প্রশ্ন।

‘তাহলে আর কি? এখন আর ডুব দেয়া চলবে না।’

‘এখন ডুব নিতে যাচ্ছে না। আগে বোটহাউস থেকে দড়ি আনতে হবে, তারপর...’

‘তারপরও হবে না। ওরা আজ সাবাদিন নড়বে না ওখান থেকে।’

‘তাহলে?’ আবার একই প্রশ্ন করল জিনা।

‘রাতে চান্দ থাকবে,’ বলল কিশোর।

‘ভেরি শুভ আইডিয়া,’ ভেলায় চাপড় মারল জিনা।

‘লুটের মাল নিয়ে চলে যাব আমরা সকালে। তারপর আসবে সাহেবরা, পাবে ঠনঠন।’ বুড়ো আঙুল দেখাল সে।

‘এখন সবে যাচ্ছ আমরা?’ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘মোটেই না,’ মাঝে নাড়ল কিশোর। ‘আমরা চলে গেলে ওরা এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সাবাদিন লেকে থাকব আমরা, ঘুরব-ঘারব। ওদের পাহারা দেব আমরা, আমাদেরকে দেবে ওরা।’

‘দুপুরে ন্য থেয়ে থাকব?’

‘না। রাফিয়ানকে নিয়ে তুমি আর জিনা থাকবে ভেলায়। আমি আর রবিন গিয়ে নিয়ে আসব খাবার।’

‘যদি আবার খাবার চুরি করে?’

‘পারবে না। ভাড়ারের আলমারির পেছনে আরেকটা ছোট ঘর আছে, দেখেছি। আলমারির ভেতর দিয়ে চুক্তে হয়। খুব ভালমত না দেখলে বোঝা যায় না কোনদিক দিয়ে কিভাবে চুক্তে হয়। ওখানে রেখে আসব।’

‘তুমি যখন দেখেছ, ওরাও তো দেখে ফেলতে পারে,’ রবিন বলল।

‘তা পারে, সেটুকু খুকি নিতেই হবে। আব কি করার আছে বলো? তবে ওরা

ଆମାଦେର ଚେଯେ ବୈଶି ଉତ୍ତେଜିତ, ସେଟା କରାତେ ଯାବେ ବଲେ ମନେ ହୟ ନା । କାଳ ଚଲେ
ଗାଏ ବଲେଛି ଆମରା, ଖାବାର ଚୁରି କରେ ରାଗିଯେ ଦିତେ ଚାଇବେ ନା ।'

'ଯଦି ପିନ୍ଧୁଲ ଜୋଗାଡ଼ କରେ ଆନେ?' ଜିନାର ପ୍ରଶ୍ନ ।

'ତାହଲେ ଆର କିଛୁ କରାର ସାକବେ ନା ଆମାଦେର । ଦେଖା ଯାକ, କି ହୟ ।'

ପନ୍ଦେରୋ

ଦେଶେ ବୈଲେ ତୁକଟେ ଗେଲ ଶାରୀଟା ଦିନ ।

ପଞ୍ଚମ ଦିନଙ୍କେ ନେମେ ଯାଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଡୁବେ ଗେଲ ଏକ ସମୟ । ଆକାଶେର ଲାଲିମା
ଥିଲେ ଦିଲ ଏକ ଟୁକରୋ କାଲୋ ମେଘ । ଶକ୍ତା ଫୁଟଲ ଜିନାର ଚେହାରାୟ ।

'ଓ କିଛୁ ନା, ସରେ ଯାବେ,' ଆଶ୍ରମ କରଲ କିଶୋର ।

ଡେଲା ଲୁକିଯେ ରେଖେ ପାଡ଼େ ନାମଲ ଓରା । ଆନ୍ତାନାୟ ଫେରାର ପଥେ ଚଟ କରେ
ଏକବାର ବୋଟିହାଉସେ ଚୁକେ ଏକ ବାଣିଲ ଦଢ଼ି ବେର କରେ ଆନଲ ମୁସା ।

ଠିକଇ ଅନୁମାନ କରେଛେ କିଶୋର, ବୁଟ୍ଟି ଏଲ ନା । ସଂଟାଧାନେକ ବାଦେଇ ପାତଳା ହୟେ
ଗେଲ ମେଘ, ତାରା ଦେଖା ଦିଲ । ପରିଷାର ଆକାଶ ।

ଶିର୍ଭିମୁଖେର କାହେ ରାଫିଯାନକେ ପାହାରାୟ ରେଖେ ଅନ୍ଧକାର ଭୋଲାରେ ନାମଲ ଓରା ।
ଶୋଟି ଦୁଇ ମୋମ ଜୁଲଲ କିଶୋର ।

ନା, କେଉ ତୋକେନି ଘରେ ।

ଖାବାର ବେର କରେ ତାଭାତାଭି ରେଯେ ନିଲ ଓରା ।

ତୁ ଯେ ପଡ଼ୋ ସବାଇ,' ବଲଲ କିଶୋର । 'ଦଶଟା ଏଗାରୋଟାର ଦିକେ ବେରୋତେ
ଥିଲେ ।

'ଏକଟା ଅୟାଲାର୍ମ-କୁକ ଥାକଲେ ଭାଲ ହତ,' ବଲଲ ମୁସା । 'ରବିନ ଠିକଇ ବଲେଛିଲ ।'

'ଆମାର ଘୟ ଆସବେ ନା,' ରବିନ ବଲଲ । 'ଠିକ ଆଛେ, ଜେଗେ ଥାକି, ସମୟମତ ତୁଲେ
ଦେଖ ତୋମାଦେର ।'

'ଘୟ ନା ଆସୁକ, ତୁ ଯେ ଥାକୋ,' ବଲଲ କିଶୋର । 'ବିଶ୍ଵାସ ହବେ ।'

ଶୋଯାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼ଲ କିଶୋର ଆର ମୁସା । ଜିନାର ଦେଇ ହଲୋ ।

ତୁ ଯେ ତୁ ଯେ ଆକାଶ-ପାତାଳ ଭାବରେ ରବିନ । ପାତାଳକଷେ ବାତାସ ତୁକରତ
ପାରନେ ନା ଠିକମତ, ତବୁ ଯା ଆସଛେ ଶିର୍ଭିମୁଖ ଦିଯେ, ତାତେଇ କାଂପଛେ ମୋମେର ଶିଖା,
ଫାରମ ଦେଖାଲେ ଛାଯାର ନାଚନ । ସତିଆ, ତାଦେର ଏହି ଅଭିଯାନେର ତୁଳନା ହୟ ନା । ଆର
ତେ ଦେଖାଇଁ, ଯତ୍ତାରଇ ଜିନା ସଙ୍ଗେ ଥାକେ, ଆୟାଭଦ୍ରେଷ୍ଟାର ଯେନ ମାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଯେ ଯାଏ ।
ତାର ଘନ ପଡ଼ଲ ସେଇ ପ୍ରେତସାଧକେର କଥା, ମୃତ୍ୟୁଧନିର ସେଇ ବୁକ-କାଂପାଲୋ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କହା...ଆର
ମାତ୍ରା ରକାର ଅଭିଯାନଟାଇ ବା କମ କି? ଏକ କାଜ କରବେ—ଭାବଲ ସେ, ରାକ ବିଚେ ଫିରେଇ
କିଶୋରଙ୍କେ ପଟିଯେ-ପାଟିଯେ ଜିନାକେଓ ଗୋଯେନ୍ଦାଦେର ଏକଜନ କରେ ନେବାର କଥା
କମାନେ । ତାନେ, ସହଜେ ରାଜି ହବେ ନା କିଶୋର । ଆଦୌ ରାଜିହବେ କିନା, ତାତେଇ
ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଆଜେ ରବିନେର, ତବୁ ବଲେ ଦେଖବେ । ଏଥବେ ଆର ଅସୁବିଧେ ନେଇ । ରାକି
ଶୀତୋଶ ପୁଲ ଚର୍ଚା ହୟେଛେ ଜିନା, ଇଚ୍ଛେ କରଲେ ଚାର ଗୋଯେନ୍ଦା କରା ଯାଏ...

ମଧ୍ୟାତାମି ବାଜାର ଦଶ ମିନିଟ ଆଗେ ସବାଇକେ ତୁଲେ ଦିଲ ରବିନ ।

সারাদিন পরিষ্কারের পর এত আবামে ঘুমিয়েছিল, উঠতে কষ্ট হলো
তিনজনেরই।

কৈরি হয়ে নিল।

বেরিয়ে এল বাইরে।

যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি শয়ে আছে রাফিয়ান, কিন্তু সতর্ক। সাড়া পেয়ে
উঠে বসল।

আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে চাঁদ। উচ্ছল জ্যোৎস্না। সারা আকাশ জুড়ে
সাতার কাটছে ছোট-বড় মেঘের ডেলা। কখনও চাঁদ চেকে দিঙ্গে, আবছা অঙ্ককারে
ভূবে যাচ্ছে বনভূমি, চাঁদ বেরিয়ে এলেই হেসে উঠছে আবার হলুদ আলোয়।

‘তাঁবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না,’ উকিবুকি দিয়ে দেখে বলল মুসা।

‘না যাক,’ কিশোর বলল। ‘তবু সাবধানের মার নেই। কোন রুকম শব্দ করবে
না। এসো যাই।’

গাছপালা আর বোপের ছায়ার পাঁচ মিনিট ইঁটিল ওরা হদের পাড় ধরে। চাঁদের
আলোয় চকচকে বিশাল এক আয়নার মত দেখাচ্ছে হৃদটাকে। শুনশুন করে গান
ধরল মুসা, জিনাও তার সঙ্গে গলা মেলাতে যাচ্ছিল, বেরসিকের মত বাধা দিয়ে
বসল কিশোর। ‘এই চুপ চুপ, গান গাওয়ার সময় নয় এটা। ব্যাটাৰা শুনলে...’

ডেলায় ঢুল ওরা।

ব্যাই উক্তেজিত, রোমাঞ্চিত। সেটা সংক্ষেপিত শয়েছে রাফিয়ানের মাঝেও।
চক্ষল। কি করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। রাতের এই অভিযান দারুণ লাগছে
তার কাছে। আবা কিছু করতে না পেরে এক এক করে গাল, হাত, চেটে দিতে লাগল
সবার।

এক রাতি বাতাস নেই। বড় বেশি নীরব। দাঁড়ের মুদ্ৰ ছপছপ শব্দও বেশি হয়ে
কানে বাজছে। পানির ছোট ছোট চেউ আর বুদবুদ উঠে সরে যাচ্ছে ডেলার গা
ঘেঁষে, ঝপালি ঝুনে ঝানুসের মত ফাটছে বুদবুদকুলো।

‘এত সুন্দর রাত খুব কমই দেখেছি, তীরের নীরব গাছপালার দিকে চেয়ে
আছে রবিন।’ এত শান্তি। এত নীরব।

তাকে বাস করার জন্যেই যেন কর্কশ চিহ্নকার করে উঠল একটা পেঁচা। চমকে
গেল রবিন।

‘যাও, গেল তোমার নীরবতা,’ হাসতে হাসতে বলল মুসা।

‘রবিন ঠিকই বলেছে,’ কিশোর বলল, ‘এত সুন্দর রাত আমিও কম দেখেছি।
ইয়ার্ডে কাজ না থাকলে, এমনি জ্যোৎস্না রাতে ছাতে উঠে বসে থাকে রাশেদচাচা,
অনেকদিন দেখেছি। আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবে।
জিজেস করেছিলাম একদিন। বিশ্বাস করবে? কেন্দে ফেলেছিল চাচা, দেশের কথা,
তার ছেলেবেলার কথা বলতে বলতে। বাংলাদেশে নাকি এর চেয়েও সুন্দর চাঁদ
ওঠে। ফসল কাটা শেষ হলে খু-খু করে নাকি ফসলের মাঠ, ধৰ্মবে সাদা। শিশির
কারে। চাঁদনি রাতে শেয়ালের মেলা বসে সেই মাঠে, বৈঠক বসে, চাচা নাকি
দেখেছে। চাচা প্রায়ই বলে, কোনমতে ইয়ার্ডের ভারটা আসার কাবে গঢ়াতে
পারলেই চাঁচাকে নিয়ে দেশে চলে যাবে...’

'আরে, এই রাফি, আবার কান থেয়ে ফেলবি নাবি?' বেরসিকের মত মুসার
গান তখন থামিয়ে দিয়েছিল কিশোর, সেই শোধটা নিল যেন এখন।

'ওই যে, বাজ্জটা না?' হাত তুলে বলল জিনা।

হ্যাঁ, বাজ্জটাই মারকার। ঠান্ডের আলো চিকচিক করছে ওটার ভেজা পিটে।
কাছে এসে তেলা ধামাল।

কাপড় খুলতে শুরু করল মুসা। জিনা সাঁতারের পোশাক পরে এসেছে। -

বিঙের মত করে পেঁচানো দড়ির বাতিলের ভেতরে হাত চুকিয়ে দিল মুসা।
ডাইড দিয়ে পড়ল পানিতে। জিনা নামল তার পর পরই।

দম কেউ কারও চেয়ে কম রাখতে পারে না।

প্রথমে ভাসল জিনার মাথা।

তার কিছুক্ষণ পর মুসার। দম নিয়ে বলল, 'বাধন কেটে দিয়েছি পৌটলাটার।
আবার যেতে হবে, দড়ি বাধব।'

জিনাকে নিয়ে আবার ডুব দিল মুসা।

দুজনে মিলে শক্ত করে ব্যাগের মুখে পেঁচিয়ে বাঁধল দড়ি। হ্যাচকা টান দিয়ে
দেখল মুসা, খোলে কিনা। খুলল না। ওপর থেকে টেনে তোলা যাবে, বাঁধন খুলে
পড়ে যাবে না ব্যাগে।

দড়ির আরেক মাথা হাতে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল মুসা। পাশে জিনা।

'হয়েছে?' জিজেস করল কিশোর

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা বাঁকাল দুজনে।

দম নিয়ে তেলায় উঠে এল জিনা আর মুসা।

'তোয়ালেটা কোথায়?' কাপতে কাপতে বলল জিনা। 'ইস, পানি তো না,
নোফ।'

ঠান্ডের দিকে নজর নেই এখন রবিন আর কিশোরের। দড়ি ধরে টেনে ব্যাগটা
তুলতে শুরু করেছে। ভাবের জন্যে একপাশে কাত হয়ে গেছে তেলা। আরেকটু
টান পড়লেই পানি উঠবে।

উল্টোধারে সরে গেল জিনা আর মুসা, রাফিয়ানকেও টেনে সরাল নিজেদের
দিকে। সোজা হলো আবার তেলা।

তীব্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফিয়ান।

আড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধমক দিল জিনা, 'চুপ! চুপ!' শক্তিত
গোবে তাকাল কুকুরটা যেনিকে চেয়ে আছে সেদিকে। 'টিকসিরা আসছে না তো?'

কাউকে দেখা গেল না। বোধহয় শেয়াল-টেয়াল দেখেছে রাফিয়ান।

ব্যাগটা তুলে আনা হয়েছে।

আব এখানে থাকার কোন মানে নেই। তীব্রের দিকে ঝওনা হলো ওরা।

ভালয় ভালয় আন্তর্নায় ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে এখন।

তেলা আগের মতই লুকিয়ে রাখা হলো। বোটহাউসে রাখলে আব ডারটি
দেখে ফেললে সন্দেহ করবে। কি ঘটেছে বুঝোও যেতে পারে।

খাড়া পাড়, শেকড় বেয়ে উঠতেই কষ্ট হয়। ভাবি একটা বোবা নিয়ে ওঠা
যাবে না। ব্যাগটা নিচে রেখে, দড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে' আগে উঠে গেল মুসা।

তার পেছনে রবিন আর জিনা। কিশোর নিচে রয়েছে। দড়ি ধরে ব্যাগটা টেনে তুলতে বলল ওদেরকে।

‘ব্যাগটা উঠে যেতেই সে-ও উঠে এল ওপরে।

চূপ করে আছে রাফিয়ান। তারমানে ঘোপের ডেডুর শাপটি মেরে নেই কেউ, আচমকা ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়বে না।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় আন্তর্নায় ফিরে এল ওরা। রাফিয়ানকে সিডিমুখের কাছে পাহারায় বসিয়ে অনেকো নেমে এল ভাঙারে।

মোম জ্বালল কিশোর।

‘আগে কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?’ প্রশ্নাব দিল মুসা।

‘ভালই হয়,’ জিনা ও রাজি।

স্যান্ডউইচ বের করে খেতে শুরু করল তিনজনে, কিশোর বাদে। সে ব্যাগ খোলায় ব্যন্ত।

‘যা বাঁধা বেঁধেছ,’ ডেজা গিট কিছুতেই খুলতে পারল না গোয়েন্দাপ্রধান, ‘কাটতে হবে।’ ছুরি বের করল ত্বৰ।

বাঁধন কাটার পরেও ব্যাগের মুখ দিয়ে ডেডুরের বাঞ্ছমত জিনিসটা বের করা গেল না। দীর্ঘ পানিতে থেকে থেকে বাঁকের গায়ে আঠা হয়ে লেগে গেছে প্লাস্টিকের চান্দর। কেটে, ছিঁড়ে তারপর বের করতে হবে।

‘দাও তো, আমাকেও একটা দাও,’ হাত বাড়াল কিশোর।

একটা স্যান্ডউইচ দিল জিনা।

খেয়ে নিয়ে আবার চান্দর কাটায় মন দিল কিশোর। ডেডুরে কি আছে দেখার জন্য অঙ্গুর হয়ে উঠেছে সবাই।

স্টীলের একটা ট্রাঙ্ক বেরোল, ফাঁকগুলো রবারের সাইনিং দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ, পানি ঢেকার পথ নেই।

তালা লাগানো নেই, নইলে আরেক ফ্যাকড়া বাধ্ত।

ডালা তুলতে শুরু করল কিশোর। দুরদুর করছে সবার বুক। ঝুঁকে এসেছে ট্রাঙ্কের চারপাশ থেকে।

ডালা তোলা হলো। ডেডুরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের অসংখ্য ছোট বাঞ্চ। সব এক সাইজের।

‘গহনার বাঞ্চ!’ হাত বাড়িয়ে একটা বাঞ্চ তুলে নিল জিনা। ঢাকনা খুলে স্থির হয়ে গেল।

সবার চোখেই বিশ্বাস।

কালো মখমলের শয়ায় কয়ে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর মেকলেস। মৌমের আলোয় জুলছে ফেন পাথরগুলো। নিচয় কোন রানী-মহারানীর।

‘এটার ছবি দেখেছি আমি,’ ত্রিভুবিড় করল জিনা। ‘ফেলোনিয়ার রানীর গলায়। তিনি পরে তাঁর এক ভাণ্ডিকে জমাদনে প্রেজেন্ট করে দেন। ভাণ্ডির বর হলিউডের নামকরা অভিনেতা, বিরাট বড়লোক।’

‘ইীরা, না?’ মুসা বলল। ‘দাম কত হবে? একশো পাউণ্ড?’

‘মাঝে মাঝে এত বোকার মত কথা বলো না তুমি। একশো হাজার পাউণ্ডেও

দেবে না।'

'থাকগে তাহলে, আমার ওসব কোনদিনই লাগবে না,' হাত নাড়ল মুসা।

'তুমি হার দিয়ে কি করবে? ব্যাটাছেলে হার পরে?' জিনা বলল।

'কে বলল পরে না? হিস্তি মার্কী গায়কগুলোর গলায় তো প্রায়ই দেখি।'

আরও কয়েকটা বাক্স খুলে দেখল ওরা। প্রতিটা গহনা দামী। ইংরা-পান্না-চুনি-মুক্তা, সবই রয়েছে। হার, কানের দুল, চুরি, আঙুটি, প্রায় সব ধরনের অলঙ্কার আছে। রাজাৰ সম্পদ।

'একসঙ্গে এত গহনা কোন মিউজিয়ামেও দেখিনি,' বলল রবিন।

'থাক, ভালই হলো,' ফোস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কিশোর, 'চোরের হাতে পড়ল না। ভাগিস আমরা এসে পড়েছিলাম। নইলে পুলিশ জানতই না, অখ্যাত এক হন্দের তলায় লুকানো ছিল এগুলো।'

'নেব কি করে?' মুসাৰ প্রশ্ন।

'সেটাই ভাবছি। ঢাঁক নিয়ে ভাবটি আৱ টিকসিৰ সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। এক কাজ কৰো, যাৱ যাৱ ব্যাগে ভৱে ফেল, যতটা পাৱা যায়। বাকিগুলোৰ বাক্স ফেলে নিয়ে কুমালে পেঁটুলা বাঁধব।'

ভাগাডাগি কৰে ব্যাগে ভৱার পৰও অনেক জিনিস রয়ে গেল। বাক্স থেকে খুলে গুলো কুমালে বাঁধতে হলো, তাতেও লাগল চারটে কুমাল। চারজনেৰ কাছ থাকবে চারটে, ঠিক হলো।

'কোকালে উঠে প্ৰথমে কোথায় যাব?' রবিন জিজ্ঞেস কৰল। 'পুলিশ?'

'অখ্যানকাৰ পুলিশৰ যা সুৰাত দেৰে এলাম,' মুৰ বাকাল কিশোৰ। 'হবে না। পোল অফিস থেকে মিস্টাৰ নৱিসকে ফোন কৰব। তিনি কিছু একটা ব্যবস্থা কৰবেন। তাকে বিশ্বাস কৰা যায়।'

'আমাত ঘূম পাল্ছে,' বড় কৰে হাই তুলল মুসা, মুখেৰ কাছে হাত নিয়ে গিয়ে আকুলগুলো কলাৰ মোচাৰ মত বানিয়ে নাড়ল বিচিৰ ভঙ্গিতে, তুকিয়ে দেবে যেন ঘূৰেৰ কৈতৰ।

গো পাল সবাই। কিন্তু ঘূম কি আৱ আসে? বিপদ কাটেনি এখনও।

শোলা

মাঝিমাদেৱ টোমেচিতে সকালে ঘূম ভাঙল ওদেৱ। সিডিশুখ দিয়ে তোদ ঢুকছে।

মাঝিমে টানে বসল কিশোৰ। অন্যাদেৱ ঘূমও ভেঙে গৈছে।

ঠিক হায়সে দেখাৰ জন্যে ওপৰে উঠে এল গোয়েন্দাৰ্প্রধান।

টিকসি মাঝিমে আছে। তাকে দেখে ভাব জমাতে চাইল, 'তোমাদেৱ কুকুৰটা কিম্বু মুৰ জাল। ধাৰেকাছে ঘৰেতে দেয় না কাউকে।'

'মুৰাবা,' নিৰস গলায় বলল কিশোৰ।

'মেঘেঁস এলাম, খাৰাৰ-টোবাৰ কিছু আছে কিনা,' হাসল টিকসি। 'লাগবে কিম্বু'।

'হাঁটাস মুল গামে উপলে উঠল কেন?' কেন, সেটা খুৰ ভালমতই বুৰাতে পাৱাছে

কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট তাদের হাত থেকে নিষ্ঠার পেতে চায় দুই ডাকাত।

'আবার তাহলে লাগবে?' কিশোরের তীব্র ঝোচাটা কোনমতে ইজম করল টিকসি। তাছাড়া তাকে ভয়ও পেতে আরম্ভ করেছে। বড় বেশি ধার ছেলেটার জিজে। ঢাঁচাহোলা কথা। কাউকে পরোয়া করে বলে না।

'নো, থ্যাঙ্কস,' আবার বলল কিশোর। 'অনেক আবার বেঁচে গেছে। কারও লাগলে বরং দিতে পারি।'

'ও...তা...তা,' আমতা আমতা করছে টিকসি। কি বলতে গিয়ে আবার কি জবাব তুনতে হবে কে জানে। 'যাজ্ঞ কখন?'

'যাৰ। আজ শুলে হাজিৱা দিতেই হবে।'

'তাড়াতাড়ি কৰো তাহলে। বৃষ্টি আসবে।'

'আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। 'কই, মেঘের নামগন্ধও তো দেখছি না।'

অন্যদিকে চোখ ফেরাল টিকসি।

মুচকি হেসে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সিডি বেয়ে নেমে এল নিচে। টিকসি যেমন চাইছে ওৱা চলে যাক, কিশোরও চাইছে সে চলে যাক। মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলে ওদেরও বেরোতে অসুবিধে।

দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল চারজনে।

টিকসি চলে যাচ্ছে, কোপের ওপর দিয়ে মাথা দেখা যাচ্ছে তার। ফিরে তাকাল একবার, এক মুহূর্ত খেয়ে দেখল, তারপর ঘুরে আবার ইটিতে লাগল।

'জলার ধার দিয়ে যেতে ভালই লাগবে,' রবিন বলল।

'সেদিন আসার সময় সক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল, ভালমত দেখতে পারিনি। আজ দেখব।'

কথা বলতে বলতে চলেছে ওৱা। জোরে পা চালাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পোড়া বাড়ির কাছ থেকে সবে যাওয়া যায়, ভাল।

সময়ের হিসেব রাখছে না ওৱা, দরকার মনে করছে না। মুসার একটা কথায় হেসে উঠল সবাই। এই সময় হঠাৎ পেছনে চেয়ে গলা ফাটিয়ে খেউঘেউ জুড়ে দিল রাফিয়ান।

ফিরে তাকাল সবাই। চমকে উঠল। দৌড়ে আসছে দুই ডাকাত।

'আরে, জলা ডেঙ্গেই আসছে। গাধা নাকি?' রবিন বলল।

'শর্ট-কাট,' কিশোর বলল। 'চোরাকাদায় পড়লে টেলা বুনবে। মরুক্কো বাটোৱা। হাঁটো। পথ ধৰে। আমরা জলায় নামাছি না।'

চলার পতি বাড়িয়ে দিল ওৱা।

'পাগল হয়ে গেছে,' ফিরে চেয়ে বলল জিনা।

'হবারই কথা,' কিশোর বলল। 'এভাবে নাকের ডগা দিয়ে লাখ লাখ ডলার চলে যাচ্ছে। নৌকায় মাল না পেয়ে নিশ্চয় আমাদের ভাঁড়ারে চুকেছিল। ট্রাইক আব বাঁকালো ওভাবে কেলে আসা উচিত হয়নি। জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলে হত।'

'আসুক না, কি হবে?' মুসা বলল। 'রাফি আছে। তাছাড়া আমরা চারজন দুজনের সঙ্গে পারব না? পিস্তল নেই ওদের কাছে।'

'তা-ও কথা ঠিক। দেখি কি হয়।'

ইপছপ করে কানাপানি ভৈতে আসছে ভারতি। তার পেছনে টিকিসি। কোথায় পা ফেলছে, খেয়ালই করছে না।

অনেক কাছে এসে পড়ল দুজনে।

গোয়েন্দাদের সঙ্গে বোকা, দৌড়ানোর উপায় নেই। ইঁপিয়ে পড়ল।

‘এভাবে হবে না,’ মাথা নাড়ল কিশোর। ‘ধরে ফেলবে। তার চেয়ে দাঁড়াই। দেখা যাব কি করে।’

ফিরে দাঁড়িয়ে ঢেচাতে শুরু করল রাফিয়ান। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা। কিন্তু কেবার করছে না ভারতি। বাঘা কুকুরের সঙ্গে লাগাতেও যেন আপত্তি নেই আর এখন। যে করেই হোক, গহনাগুলো তার চাই।

আর বেশি বাকি নেই, ধরে ফেলবে ছেলেদের, এই সময় বিপদে পড়ল ভারতি। আঠাল কানায় আধ হাত ডুবে গেল পা। কোনমতে টেনে তুলে আবেক জায়গায় ফেলল, ভাবল ওখানটায়ও নরম কাদা। কিন্তু তলায় পাথর বা শক্ত অন্য কিছু রয়েছে, যেটাতে জোরে পা পড়ায় বেকায়দা রকম কাত হয়ে গেল পা, গোড়ালি গেল মচকে। চেঁচিয়ে উঠল, ‘বাবারে, গেছি! আমার পা গেল! উফ্! আধহাত কাদার মধ্যেই রসে পড়ল সে।

তাকে তোলার জন্যে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে টিকিসিরও দুই পা দেবে গেল কানায়, একবারে ইটু পর্যন্ত। টেনে তোলার জন্যে জোরাজুড়ি করতেই আবও ডুবে গেল পা। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, ভাবল চোরা কানায় ডুবে যাচ্ছে।

ভালমত আটকেছে দুজন। এমন এক জায়গায়, কেউ গিয়ে সাহায্য না করলে বেরিয়েই আসতে পারবে না। সাহায্যের জন্যে অনুনয় শুরু করল।

মায়া হলো রবিনের। ‘যাব নাকি?’

‘পাগল হয়েছ,’ বলল মসা।

‘থাক,’ কিশোর বলল, ‘শিক্ষা হোক কিছুটা। আমরা গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেব। চোরাকানায় পড়েনি, নরবে না। তুলতে গিয়ে আমরাই শেষে পড়ব বিপদে।’

ওদেরকে দেবে কুশি হলো পোস্টম্যান। ‘কেমন কেটেছে, অ্যা? টু-ট্রাইজে?’

‘খুব ভাল,’ বলে অনাদের দেবে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর।

বাড়িতেই পাওয়া গেল মিস্টার নবিসকে। শুনে তো প্রথমে চমকে উঠলেন। বললেন, ‘তোমরা ওখানেই থাকে। আমি আসছি।’

ঝোড়ার গাড়ি নিয়ে পৌছে গেলেন নরিস। ছেলেদের গাড়িতে তুলে নিলেন। ধামৰঞ্জির কাছে গিয়ে কিছুই হবে না, সোজা চললেন শেরিফের কাছে। জেলখানাটার কাছেই শেরিফের অফিস।

শেরিফ লোক ভাল, বৃক্ষিমান। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, লিকলিকে শরীর। সব তনে শিস নিয়ে উঠলেন। পেটুলো খুলে প্রথমেই তুলে নিলেন ফেলোনিয়া নেকলেসটা।

‘এটা যে কত খোজা খুঁজেছে পুলিশ,’ বললেন তিনি। বেল বাজিয়ে সহকারীকে থেকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে বললেন ‘হ্যারি, তিনজন লোক নিয়ে যাও। আকাতনুটোকে তুলে আনোগো।’

আবাক হয়ে উন্ন হ্যারি। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। হেসে

বলল, 'তোমরা বাহাদুর। যাই, নিয়ে আসিগে পাঞ্জিলোকে।'

গহনাশুলো শেরিফের নায়িতে দিয়ে দিল ছেলেরা। তবে প্রতিটি জিনিসের একটা লিস্ট করে তাতে 'বিসিভড' লিখিয়ে শেরিফের স্বাক্ষর নিয়ে নিল। সাক্ষী রইলেন মিস্টার নরিস। কাগজটা ডাঁজ করে সমত্বে পকেটে রেখে দিল কিশোর।

'পাখোয়াজ ছেলে,' তারিফ করলেন শেরিফ। 'বড় হয়ে কি হওয়ার ইচ্ছে!'

'হয়তো গোফেনাই থেকে যাব,' বলল কিশোর। 'জানি না এখনও।'

শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোল ওরা। আমারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক চাপ্চাপি করলেন মিস্টার নরিস, কিন্তু রাজি হলো না ছেলেরা। স্কুল কামাই করবে না।

শেষে তাদেরকে বাস স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিলেন মিস্টার নরিস।

বিদায় নেয়ার আগে একে একে সবাই হাত মেলাল তাঁর সঙ্গে। গাঁথীর মুখে রাফিয়ানও একটা পা বাড়িয়ে দিল।

হেসে উঠলেন মিস্টার নরিস। 'তুই একটা কুকুর বটে, রাফি। তোর মত একটা কুকুর যদি আমার থাকত।'

গো গো করে কুকুরে-ভাবায় কিছু বলল রাফিয়ান, বোধহয় বলেছে, 'ঠিক আছে, যান। জিনা তাড়িয়ে দিলেই চলে আসব আপনার কাছে।'

তার কথা যেন বুঝতে পারল জিনা, তাড়াতাড়ি গলার বেল্ট ধরে রাফিয়ানকে কাছে সরিয়ে নিল। *

হাসল সবাই।

আবার এদিকে কবনও বেড়াতে এলে যেন তাঁর বাড়িতে ওঠে, বার বার আমঙ্গল জানিয়ে বিদায় নিলেন মিস্টার নরিস।

বাস আসতে বোধহয় দেবি আছে।

মুসা বলল, 'কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'বুর ভাল,' বলল কিশোর। 'আমিও একথাই ভাবছিলাম।' আবারের দোকানটা দেখিয়ে বলল, 'চলো, ডিকের মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে। বলেছিলেন ফেরার পথে দেখা করে যেতে।'

ছেলেদের দেখে খুব খুশি হলেন বৃক্ষ। তবে আগের বারের মতই রাফিয়ানকে ডেতরে চুক্তে দিলেন না, দরজার বাইরে রাখলেন। আদর-অভ্যন্তর পর টুকটাক আরও কিছু কথা, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কটা স্যাঙ্গউইচ লাগবে?'

'আজ বেশি লাগবে না, বাড়ি ফিরছি তো,' বলল কিশোর। 'তাছাড়া পথে খিদে পেলে খাবার পাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে,' ঘুরে রাম্মাঘারের দিকে রওনা হলেন বৃক্ষ। দরজার কাছে পিয়ে ফিরলেন। 'হ্যাঁ, কেউ এলে ডেকো।'

চলে গেলেন দরজার ওপাশে।

তিনি গোয়েন্দা সিরিজ

ছুটি

রকিব হাসান

শীকারোভি:

বাংলা e-book-এর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে এবং সব জায়গার ইন্টারনেট কানেকশনের গতি সমান নয়। তাই চেষ্টা করতে হয়েছে ফাইলের সাইজ যথা সম্ভব ছোট রাখার। ফলে অনিবার্য ভাবে কমাতে হয়েছে ছবির Resolution. পাঠকের এই অসুবিধার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রাপ্তী।

Scanned by: Shabab Mustafa

*Send your feedback at:
shabab.mustafa@gmail.com*